মুনতাসীর মামুন

গণহত্যা, রাষ্ট্র ও জাদুঘর

১৯৭১-এর বাংলাদেশ: একটি পর্যালোচনা

গণহত্যা আদি পাপ। রুশো যে প্রাকৃতিক যুগের কথা বলেছেন তা পেরুবার পরই বোধহয় গণহত্যার শুরু। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে এটি আরো গুরুত্ব পায়। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বিজয়ীদের ইতিহাস পড়েছি, পড়িয়েছি। এসব কাহিনির সংক্ষিপ্তসার এরকম যে, একটি গোত্র বা ব্যক্তিশাসক দেশ বিজয়ে বেরিয়েছেন। একের পর এক দেশ জয় করেছেন। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা তাকে উপাধি দিচ্ছেন 'গ্রেট', যদি সে বিজয়ী পাশ্চাত্যের হন। যেমন আলেকজান্ডার দি গ্রেট। চেঙ্গিস খা বা তৈমুর লংয়ের আগে কখনও গ্রেট জুড়ে দেওয়া হয়নি। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের বয়ানে পাশ্চাত্যের গ্রেটদের সম্পর্কে আছে তারা বিজয়ী, হ্যাঁ বিজয়ের সময় কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ তারা করেছেন। বয়ানে জয়ের বিষয়টি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে ধ্বংসের বিষয়টি তত নয়। চেঙ্গিস বা তৈমুর যখন বয়ানের বিষয়বস্তু তখন তাদের ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। দু'পক্ষের যুদ্ধ আমরা গণহত্যার মধ্যে ধরিনা। রাষ্ট্র যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তো নয়ই। আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ করেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ করতে চায়নি। আমেরিকা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ভিয়েতনাম প্রতিরোধ করেছে। আমেরিকানরা অনেক বেসামরিক মানুষও হত্যা করেছে কিন্তু সেগুলি বা সেসব ঘটনা গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। জবরদস্তি করে ভিয়েতনামী রমণীর গর্ভে মার্কিনির সন্তান যেটিকে বলা হয়ে থাকে 'আমেরিকানাইজেশন' তার কথা অনুল্লিখিত থেকে যায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মার্কিনি সন্তান আমেরিকার বিরুদ্ধে যাবে না। গণহত্যার পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে এটি গণহত্যার সামিল। কিন্তু আমেরিকার বিষয়ে এটি উচ্চারিত হয় না।

প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। বর্ণ, জাতিগত বিদ্বেষ, উচ্চবর্গীয় বোধ থেকে সাধারণ মানুষ কেনো যাদের

আমরা শ্রদ্ধা করি তারাও বেরুতে পারেননি। আমরা তাদের একটি দিক স্মৃতিতে রাখি, অন্য দিকটি ভুলে যাই। আমাদের দরকার আদর্শ পুরুষ বা 'হিরো'। সেটি আমরা আমাদের মতো নানা মিথে সাজিয়ে নির্মাণ করি। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের আলোচনা না করেতো আর ফরাসি বিপ্লবের আলোচনা করা যায় না! আমি ভলতেয়ার ভক্ত হিসেবে গেলাম জেনিভায় ভলতেয়ার জাদুঘরে। ভলতেয়ার যে বর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন তার কোনো ইঙ্গিতই সেখানে নেই। ভলতেয়ার 'হিরো' সে ভাবেই জাদুঘরটি নির্মিত। ভলতেয়ার হিরো এবং মানুষও, সে ভাবেও নির্মিত হয়নি জাদুঘর। অর্থাৎ জাদুঘরও রাজনীতির অংশ। মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বারবার ফিরে আসে। এমনকী মানবাধিকার প্রশ্নেও। এর রচয়িতা থমাস জেফারসন যার কথা আমাদের বারবার পড়তে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাও এর আদলে তৈরি হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তকে এর সব কিছুই পাওয়া যাবে, শুধু উল্লেখ পাওয়া যাবে না যে, তিনি ছিলেন দাস মালিক, যেমন ছিলেন ওয়াশিংটন। এসব বক্তব্য প্রদান করলেই বক্তব্য প্রদানকারীকে নিমিষে 'র‍্যাডিক্যাল', 'কমিউনিস্ট', 'এনার্কিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে বেকায়দায় ফেলা হয় বিশেষ করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে। প্রতিক্রিয়া এমনই শক্তিশালী। কান্টও ছিলেন বর্ণবাদী, কান্ট ভক্তরা যা কখনও উল্লেখ করবেন না।[১]

মানবাধিকার নামে একটি প্রত্যয় নির্মিত হয়েছে সত্যি কিন্তু সেটিও প্রশ্নবিদ্ধ। সে কারণেই সেই আদি পাপ থেকে মুক্তি পাইনি বরং যুগে যুগে প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের নামে গণহত্যা হয়েছে। তবে, গণহত্যার আগে একটি অজুহাত বা সুযোগ সৃষ্টি করেন গণহত্যাকারী, কখনও কখনও তাত্ত্বিক কাঠামোও তৈরি করেন। গণহত্যার সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রথমে প্রভাব বলয় তৈরি করেন, সম্ভব হলে তারপর বাইরে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা। কোনো রাষ্ট্রই এর বিরুদ্ধে জোরালো কোনো অবস্থান নেয়নি। অর্থাৎ, বৃহৎশক্তির স্বার্থ হানি না হলে গণহত্যা চলতে পারে। এক্ষেত্রে চিন, রাশিয়া, জাপান, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র সবার ভূমিকাই মোটামুটি একই রকম। মিয়ানমারের সিভিল সমাজ বা অং সাং সূচিও অন্য কোনো সিভিল সমাজের তেমন সমর্থন পাচ্ছেন না। কারণ, তারা রোহিঙ্গা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত এবং সমর্থন করেছেন। এখান থেকে একটি বিষয় শিক্ষণীয়। শাসকের গণহত্যার বিরুদ্ধে সিভিল সমাজ প্রতিবাদ না করলে তারাও হত্যার শিকার হয়। মিয়ানমারে এখন পর্যন্ত ৯০০জন সরকারি হিসাবে নিহত হয়েছেন। 'গণহত্যা' না বললে যা ঘটছে তাকে 'ম্যাসাকার' তো বলা যেতে পারে। সেটিও এখন পর্যন্ত কেউ বলছেন না।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে এ হত্যাকাণ্ড বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সময়ও একই যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা সমর্থন করেছিল পাকিস্তানি সিভিল সমাজ। এখন সে রাষ্ট্র জঙ্গিবাদী একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। বিশ্ব সিভিল সমাজের সমবেদনা থেকে তারা বঞ্চিত।

এই যে রাজনীতি- এটি কু-রাজনীতি বা অপরাজনীতি। এর বিপরীতে আমাদের কর্তব্য স্বচ্ছ/প্রগতিশীল রাজনীতির স্বার্থে গণহত্যা বা বর্ণবাদ বা জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে রাজনীতিকে সোচ্চার করা, বারবার হটে যেতে হলেও, তাহলে অপরাজনীতির স্পেস হ্রাস পায়। এর উদাহরণ ট্রাম্প আমল। যে আমেরিকাকে তুলে ধরা হয় মানবাধিকার রক্ষার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, সেই ট্রাম্প দেখালেন সেটি এক ধরনের মিথ। কিন্তু, আগেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বজুড়ে যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে কারণে, এই অপরাজনীতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। কিন্তু, এর বিপরীতেও মানুষ দাঁড়িয়েছিল যেটি বিশ্বজুড়ে আশার বাণীও যুগিয়েছিল এবং তা প্রভাবান্বিত করেছিল মার্কিন নির্বাচনকে। এই বিপরীত রাজনীতির মূলে ছিল ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার। এর প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে নয়, ইউরোপেও পড়েছিল। ব্রিটেনে দাস কারবারির ভাস্কর্য যা স্বমহিমায় বিরাজ করছিল সমুদ্র তীরে তা ফেলে দেয়া হয়েছিল সমুদ্রে। বেলজিয়ামে রাজা লিওপোল্ডের ভাস্কর্যে কালিমা লেপন করা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে অনেক আইকনের ভাস্কর্য পাহাড়া দিয়ে রাখতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে মানুষ এভাবে একটু একটু করে জমি উদ্ধার করেছে। সমাজ বা পৃথিবী এভাবেই এগিয়েছে।

২

গণহত্যা-নির্যাতনের একটি রাজনীতি আছে। রাজনীতি না বলে অপ-রাজনীতিও বলা যায়। ক্ষমতায় যারা আসীন তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন, আধিপত্য বিস্তারের জন্য, প্রতিহিংসা নিবারণের জন্য নির্যাতন এবং তাতে কাজ না হলে গণহত্যা নির্যাতন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যা-নির্যাতন দিয়েই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা রাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বাঙালির যে কোনো আন্দোলনকে চিহ্নিত করা হয়েছে হিন্দু বা হিন্দু প্রভাবিত বা ভারতীয় প্রভাবিত আন্দোলন হিসেবে। শুধু তাই নয় যে কোনো আন্দোলনই ছিল ইসলাম বিরোধী। এই ইসলামকে রক্ষার জন্য জনগণকে আহ্বান জানানো হয়। সব সময়ই উপনিবেশে শাসকদের হয়ে

শাসকদের কাজ করার জন্য একদল যোগসাজশকারী সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র [শাসক] ও উপনিবেশের যোগসাজশকারীরা তখন উপনিবেশে বসবাসকারী জনগণের মানসজগতে ঐ ভাবাদর্শ আধিপত্য বিস্তারের সহায়তা করে।

জিয়াউল হক এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন– "পাকিস্তান যতই ক্রমান্বয়ে নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বে একটা মডেলে পরিণত হতে থাকল, ততই দেশটির পুঁজিবাদী/সামন্তবাদী ব্যবস্থায় একটা উপর ভাসা ইসলামী চাকচিক্য লাগানো হলো এবং ইসলাম উচ্চ শ্রেণীগুলির ভাবাদর্শে পরিণত হলো। এই সত্যটি ১৯৫৬, ১৯৬২ ও ১৯৭৩ সালে সৃষ্ট পাকিস্তানের তিনটি শাসনতন্ত্রেই পরিলক্ষিত হয়।"[২]

১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে ১৯৭ ধারায় বলা হয়েছিল যে, "প্রকৃত ইসলামী ভিত্তিতে একটা মুসলমান সমাজ গড়ার ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষায় তত্ত্বাবধান ও ইসলামী গবেষণা করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি সংগঠন তৈরি করবেন।" ১৯৮ ধারায় বলা হয় "পবিত্র কোরান ও সুন্নাহয় বর্ণিত ইসলামী ধারার পরিপন্থী কোনো আইন পাশ করা যাবে না; এবং বিদ্যমান আইন সমূহকেও এই ধারার উপযোগী করা হবে।"[৩] জিয়াউল হকের আরেকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য এ কারণে যে, আজকের বাংলাদেশ সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। তিনি লিখেছেন, "ধর্মের রাজনীতিকরণ দরিদ্র জনগণের বিভ্রান্তি ও তাদের উপর শোষণকেই আরো বৃদ্ধি করে এবং যে দুর্নীতিকে তারা চারদিকে দেখে আসছে এবং যে দুর্নীতির ভিতরে তারা সুদীর্ঘকাল ধরে আটকে রয়েছে, সেটিই বৃদ্ধি করে।"[৪]

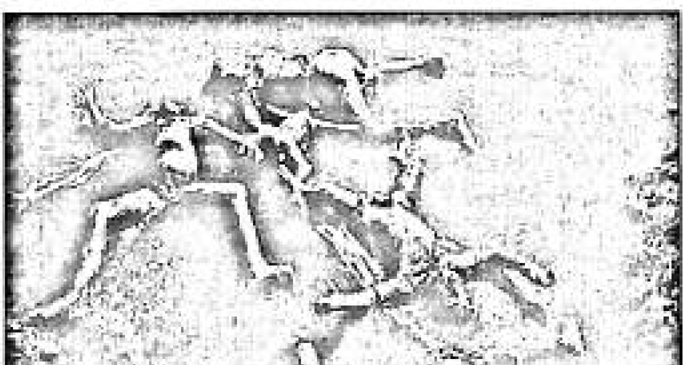

গণহত্যা বাংলাদেশে, আলোকচিত্রঃ সংগ্রহ

এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৯ সাল

থেকে পাকিস্তান বিরোধী অভিধায় অভিহিত হয়েছেন। আরেকটি অভিধা ছিল– কমিউনিস্ট। সেই ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।[৫]

জুলফিকার আলী ভুট্টো যিনি পাকিস্তান ভাঙ্গা শুধু নয়, ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্যও দায়ী, তিনিও লিখেছিলেন, কেন্দ্র কখনও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ন্যায্য বিচার করেনি। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং বাঙালির বঙ্গবন্ধুকে ম্যান্ডেট প্রদান পশ্চিম পাকিস্তান মেনে নিতে পারে নি।[৬] তাই, প্রথমে পরিষদ অধিবেশন স্থগিত, অসহযোগ আন্দোলন দমনে প্রতি রাতে গুলি করে হত্যা এবং তারপর ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু হয়। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন, ৩০ লাখ হত্যা করলেই তারা হাঁটু গেড়ে বসবে।

১৯৭১ সালে বগুড়া ও ঠাকুরগাঁয় কর্মরত ছিলেন লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান। হামুদুর রহমান কমিশনে তিনি বলেছেন, জেনারেল নিয়াজী তার ইউনিট পরিদর্শনকালে জিজ্ঞেস করেন, 'কয়টি হিন্দু মেরেছ?' মে মাসে ২৩ ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার আবদুল্লাহ্ মালিক লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন হিন্দু হত্যার। ব্রিগেডিয়ার ইকবালুর রহমান হামাদুর রহমান কমিশনে বলেছিলেন জেনারেল গুল হাসান সৈন্যদের জিজ্ঞেস করতেন, 'কয়জন বাঙালি মেরেছ?' ৮ম বালুচের কমান্ডার লে. কর্নেল আজিজ আহমদ খান জানিয়েছেন, 'ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুরে সব বাড়ি পুড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। আমি তা করেছি।' ব্রিগেডিয়ার মালিকের নির্দেশে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে একরাতে ১৭জন বাঙালি অফিসার ও ৯১৫জন হত্যার অভিযোগ আনা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের বা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের হত্যার সময় বলা হতো– 'বাংলাদেশ পাঠাও।' মেজর জেনারেল ফরমান আলী যাকে বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী করা হয়, তিনি বলেছিলেন–

'Harrowing tales of rape, loot, arson, harassment and of insulting and degrading narrated in general term."[৭] জেনারেল নিয়াজি বলেছিলেন– 'you scratch any Bengali and he is separa tionist.' শুধু তাই নয় আরো লিখেছিলেন– "There must be more killing, more mopping up and more with hunting."

নিয়াজির লেখা [স্বাক্ষরবিহীন, টাইপ করা] গণহত্যার নীল নকশার একটি কপি গণহত্যা জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। সেখানে কী ভাবে বাঙালিদের হত্যা করে পদানত করতে হবে এবং বিহারিদের পুর্ণবাসন করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন।[৮]

গণহত্যার একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা। এ তত্ত্ব নির্মাণ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পর। এই তত্ত্বের মূল কথা ছিল– বাঙালি মুসলমানরা পুরোপুরি বা 'খাস' মুসলমান নয়, তারা আধা মুসলমান। ভারতীয় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দ্বারা তারা প্রভাবিত। এ কারণে তারা কেন্দ্রের কর্তৃত্ব মানতে চায় না যারা খাঁটি মুসলমান। বাঙালিদের মাথা খারাপ করেছে হিন্দু শিক্ষকরা। এবং হিন্দুরা বা ভারত পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে বাঙালিদের মাধ্যমে। ছয় দফা হচ্ছে সে ভাঙনের হাতিয়ার। সুতরাং ধর্ম রক্ষার জন্য যা পাকিস্তানের সমার্থক এদের শায়েস্তা করতে হবে, পদানত করতে হবে। সৈন্যদেরও বলা হয়েছিল তারা কাফেরদের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে।[৯]

১৯৭১ সালে ধর্ম রক্ষার জন্য গণহত্যা শুরু করে পাকিস্তানিরা। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি এ তত্ত্ব সমর্থন করে পাকিস্তানকে সহায়তা করে। পাকিস্তান যে মুসলমান হত্যা করছে তা তাদের মনে হয়নি। বলা যেতে পারে, এটি ছিল মুসলমানদের হাতে সবচেয়ে বৃহৎ মুসলমান হত্যার ঘটনা। অথচ, বাঙালির যুদ্ধ জয়ের পর এরাই আবার ও আই সি বা ইসলামী দেশসমূহের সংস্থার সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। আলজিরিয়ার বুমেদিন নিজের প্লেন পাঠিয়ে দেন।

এ নিয়ে বাংলাদেশেও বিতর্ক হয়েছে। অনেকে মনে করেছেন, যে ইসলামি দেশগুলি গণহত্যা সমর্থন করেছে। মাত্র গণহত্যা শেষে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে গণহত্যা সমর্থনকারীদের পরোক্ষ সমর্থন করা হয়। এবং এর প্রতিবাদ জানানো দরকার। তাদের সম্মেলনে যোগ না দেয়া একটি প্রতিবাদ। ভারতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সাংবাদিক মানস ঘোষ তখন ঢাকায়। লিখেছেন তিনি–

বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে যাবেন, এ ঘোষণার পর মানস ঘোষ সচিবালয়ে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাকে দেখে মোশতাক বলেন, "বাবু মানস ঘোষ, আপনাদের পিতামহের (সুবিমল দত্তকে তার অশীতি বৎসর বয়স্কের জন্য তাকে অনেকে ওইভাবে সম্বোধন করত) শতশত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে গিয়ে ও আই সি সম্মেলনে যোগদান আটকানো গেল না। দেখুন না লোকেরা তার সিদ্ধান্তে কতটা খুশি হয়ে মহল্লায় মহল্লায় আহ্বান জানাচ্ছে মাইকে গান বাজিয়ে। আপনারা চাননি তিনি পাকিস্তান যান। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা চেয়েছি তিনি যান। পাকিস্তানের সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করুন। সেটাই হতে যাচ্ছে। উনি লাহোর যাবেন। ভুট্টো ঢাকায় আসবেন। পিতামহকে বলুন ভারতের খেলা বরবাদ হয়ে গেল।"[১০]

তারপর ভুট্টো ঢাকায় এলেন। দীক্ষিত তখন ঢাকায় হাইকমিশনার। ঢাকাবাসীর একটি অংশ প্রফুল্লচিত্তে তাকে সম্ভাষণ জানালো। দীক্ষিত এত বিচলিত হয়েছিলেন তা দেখে যে, লিখেছেন, তার চোখে পানি চলে এসেছিল।[১১]

এসব বিবরণ দেখে মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে, বাংলাদেশের মানুষের একটি অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো বন্ধন না থাকুক এটি চায়নি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতারাও ছিলেন। জিয়াউর রহমান ও তারপর এরশাদ, খালেদা জিয়া প্রমুখ প্রায় তিন দশক এ ধারাটি আরো পুষ্ট করেছেন। তারা গণহত্যা ঘটেছে এটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলি ছিল মার্কিন বলয়ে। চীনের বলয়ে ছিল তখন মাত্র কয়েকটি দেশ। চীন তখন মার্কিন আনুকূল্য পেতে আগ্রহী। ফলে, মার্কিন ও চীন বলয়ে থাকা অধিকাংশ দেশ গণহত্যা সমর্থন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত কারণে ভারতকে সমর্থন করেছে এবং সে কারণে বারবার ইয়াহিয়াকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। তবে, অন্তিম মুহূর্তে সোভিয়েত ভেটো বাংলাদেশ ও ভারতকে সহায়তা করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, একটি রাষ্ট্র যখন আধিপত্য বিস্তারে নিজ জনগোষ্ঠিকে দমন করতে গণহত্যা চালায় তখন অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ মানবতার দিকটি প্রায় বিচার করে না। তার বিবেচ্য হয়, নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং ভূকৌশলগত রাজনৈতিক স্বার্থ। পৃথিবীর সবচেয়ে বহত্তম গণহত্যা এ কারণে বিশ্বের সরকারসমূহ সমর্থন করেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যা-নির্যাতন বিশ্বে উপেক্ষিত হলো। ১৯৭১ সালের পর গণহত্যা নিয়ে কোষগ্রন্থ বেরিয়েছে, লেখালেখি হয়েছে, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের গণহত্যা উপেক্ষিত হয়েছে। এর কারণ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। গণহত্যার বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হলে, নৈতিকভাবে তা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, আমেরিকা ও ইউরোপ নিজেদের মনে করে মানবাধিকার ও নৈতিকতার ধ্বজাধারী। তাদের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে জোর দেয়া হয়। মার্কিন কংগ্রেসে এসব বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করা হয়। ১৯৭১ সালের ঘটনাটি যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ বা বাঙালি নিধন যে নৈতিকতা বিরোধী সে সম্পর্কিত রিপোর্ট যতদূর মনে পড়ে পেশ করা হয়নি।

বাংলাদেশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি নারী পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল। পৃথিবীতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা এর আগে ঘটেনি। আলোকচিত্র: নাইব উদ্দিন আহমদ

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও এক্ষেত্রে বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিজয়কে। সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ বাঙালির ইতিহাসে এতবড় বিজয়তো আর আগে আসেনি। সুতরাং, চতুর্দিকে বিজয়গাঁথা উচ্চরিত ও প্রচারিত হতে লাগল। এ বিজয়ে যে অবরুদ্ধ দেশের মানুষরা ছিলেন তাদের অবদান ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেয়া শুরু হলো। এর অর্থ হলো এরাই বিজয়ী, বাংলাদেশকে তারা মুক্ত করেছেন। এই সনদ যার কাছে থাকবে তিনিই রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন। অনেকটা বিজয়ী দেশের সেনাদের মতো। কিন্তু সেটা যদি অন্যদেশ হতো তাহলে বলা যেত এরা বিজয়ী, বিজিতদের ওপর তাদের অধিকার আছে যেমন ছিল প্রাচীন বা মধ্যযুগে। মুসলমান ভোকাবলারিতে তো 'গণিমতের মাল' নামে একটি শব্দই আছে। সাংবাদিক এনায়েতউল্লাহ খান তখন প্রশ্ন রেখেছিলেন, ছয়কোটি [দেশে থাকা] মানুষ কি তাহলে রাজাকার? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তখন কেউ দেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের তালিকা যে ছয়বার বদল হলো এবং আজ ৫০ বছর পরও সে তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে তা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার জন্য। এ মন্তব্য অনেককে আহত করতে পারে কিন্তু এটিতো সত্য। এ কারণেই উপেক্ষিত হলো ৩০ লাখের ওপরে মানুষের শহিদান ও পাঁচ লক্ষের ওপর নারীর নির্যাতন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের পরিহাসতো বটে।

অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিন দশক পাকিস্তানিমনা জেনারেলরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ শাসন করেছেন। বলা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসকরা পাকিস্তানের এজেন্ডা পালন করেছেন।

এই এজেন্ডার অন্যতম ছিল পাকিস্তানিরা যে হানাদার, খুনি, ধর্ষক, লুটেরা একথাটা ভুলিয়ে দেওয়া। তাহলে, যোগসাজশকারীদের কোনো অপরাধের কথা মনে আসবে না।

এই এজেন্ডার সাব এজেন্ডা ছিল বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির অবলেপন। এ জন্য বহুমুখি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রথমেই তারা গণহত্যার চেয়ে বিজয়ের ওপর জোর দিয়েছে। এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে সে সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছিল সেগুলি অক্ষুন্ন রেখে মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিলকে তার জয়গান গাইতে সম্মত করিয়েছে। এরশাদ আমলেও মুক্তিযোদ্ধারা একই কাজ করেছেন। সুবিধার জন্য তারা এ কাজ করেছেন তা কি অস্বীকার করা যাবে? বিজয়ের ওপর জোর দিয়ে তারা এ কথাই বলতে চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু তো যুদ্ধে ছিলেন না। তাজউদ্দিন বা অন্য নেতারা তো যুদ্ধে ছিলেন না, ছিলেন ওসমানী। লক্ষ্য করবেন, যেখানে ৭ই মার্চের বক্তৃতা হয়েছিল, যেখানে পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেছিল সেখানে শিশুপার্ক করা হয়েছিল। জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের একজন নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা বিমানবন্দরের নামকরণ হয়েছিল তার নামে।

ওসমানীর নামে যে কতো কিছু হয়েছে তার তো ইয়ত্তা নেই। গণহত্যার বিষয় অনুপস্থিত। বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনাদের পুর্নবাসনের জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা জিয়া প্রত্যাহার করেছিলেন। কারণ, গণহত্যা-নির্যাতনের বিষয় উঠলে বা স্মৃতিতে থাকলে পাকিস্তানি সৈন্য, রাজনীতিবিদ ও তাদের যোগসাজশকারী বাঙালিরাও থাকেন। জিয়া তখন তাদের ওপর রাজনৈতিক বিধি নিষেধ উঠিয়ে নিয়েছেন, তারা মিত্র। হত্যাকারীরা তো জিয়ার মিত্র হতে পারে না। সে জন্য সমন্বয়ের রাজনীতি চালু হলো। এরশাদ সেগুলি চালু তো রাখলেনই বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র বানিয়ে দিলেন। পাকিস্তানিদেরও এ এজেন্ডা ছিল যা আগে উল্লেখ করেছি। খালেদা খুনিদের, ধর্ষকদের ক্ষমতায় বসালেন। এবং গণহত্যায় ৩০ লক্ষ শহিদ হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন ওঠালেন। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, পাঠ্যপুস্তক বদলালেন। ৩০ বছরে তিনটি জেনারেশনকে এভাবে তারা তাদের মতাদর্শে দীক্ষিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জিয়া এরশাদ খালেদা জাতিকে শুধু বিভক্ত নয়, মৌলবাদী জঙ্গিদের হাতও শক্তিশালী করলেন। এরাই এখন ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করছেন। সেক্যুলার শিক্ষার বদলে কওমী শিক্ষা জোরদার করছেন। এর অনেকটা যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রশ্রয়ের কারণে হয়েছে, তা তারা স্বীকার না করলেও ইতিহাস তো মুছে ফেলা যাবে না। এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরেকটি বিষয় যা আগে

উল্লেখ করেছি তাহলো, মুক্তিযুদ্ধ হলেও 'পাকিস্তান' প্রত্যয়টি বাঙালির মানসজগত থেকে উৎপাটন করা যায়নি।

৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর নাজি বা হিটলারের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হলোকাস্ট নামে পরিচিত। পৃথিবীতে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ জাতি হলো ইহুদি জাতি। তারা যে যেখানে থাকুক তাদের বিষয়ে তারা এক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের কথিত হাজার বছরের পরিব্রাজ্য থামল। ইহুদীদের রাষ্ট্র ইসরায়েলের সৃষ্টি হলো। এই যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো সে কি ইহুদীদের প্রতি নিছক সমবেদনা? তাতো নয়, আরব রাজ্যে পাশ্চাত্যের নিজেদের প্রতিনিধি বা প্রক্সি হিসেবে সৃষ্টি করেছে ইসরায়েলের। পাশ্চাত্য ও আমেরিকা তাতে সহায়তা করেছে। আমেরিকায় ইহুদীরা ছিলেন প্রভাবশালী এবং পুঁজির নিয়ন্ত্রক। রথসচাইল্ড এর পরিবারের বৃহৎ অংশতো আমেরিকারই। আমেরিকা ইহুদিদের যেমন আশ্রয় দিয়েছে, তেমনি জার্মানির পতনের পর নাজি অপরাধী ও সমব্যথীদেরও আশ্রয় দিয়েছে। ইহুদীরা যে তা জানত না তা নয়। অন্যদেশে নাজিদের আশ্রয় দিলে তারা উচ্চকিত হয় কিন্তু আমেরিকার ব্যাপারে তারা ছিল নিশ্চুপ বরং তাদের রাষ্ট্রগঠনে যাতে মার্কিন সাহায্য অব্যাহত থাকে তাতে তারা মনোযোগ দিয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাজি গণহত্যা সম্পূর্ণ ইউরোপে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। নাজি অধিকৃত ইউরোপের সব দেশেই নাজিরা গণহত্যা চালিয়েছে, ব্যাপক নির্যাতন করেছে। ইউরোপের সাধারণ মানুষ সেটি ভুলতে পারেনি। সে সব দেশে গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় ও মানুষের লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি নাজি ও ফ্যাসিস্ট নির্যাতন যাতে আর না হয় সে জন্য গণহত্যা ও নিপীড়নের স্মৃতি জাগরূক রাখতে চেয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইহুদিরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

নুরেমবার্গ বিচার এতে সহায়তা করে। এর ফলেই দেখি গত ৮০ বছর ইউরোপে বিজয় দিবস যেমন পালন করা হয় তেমনি বিভিন্ন সময় গণহত্যাও স্মরণ করা হয়। গত ৮০ বছর ইউরোপে নাজি ও ফ্যাসিস্ট অত্যাচার নিয়ে অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কবিতা, গান, গবেষণা, গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে, গণহত্যার বিষয়টি ভুলতে দেয়া হয়নি। অনেক দেশে আইন হয়েছে হলোকাস্ট নিয়ে বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। শিশুকাল থেকেই স্কুল ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় এ ধরনের জাদুঘরে। এর একটি ফল পাওয়া গেছে। ইউরোপে আর নাজি বা ফ্যাসিজমের উদ্ভব হয়নি।

হলোকাস্টের স্মৃতি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। এভাবে, বিশ্বে হলোকাস্ট মানেই ইহুদী নিধনে দাঁড়িয়েছে। যদিও হলোকাস্ট মানে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রাজনীতিও আছে।

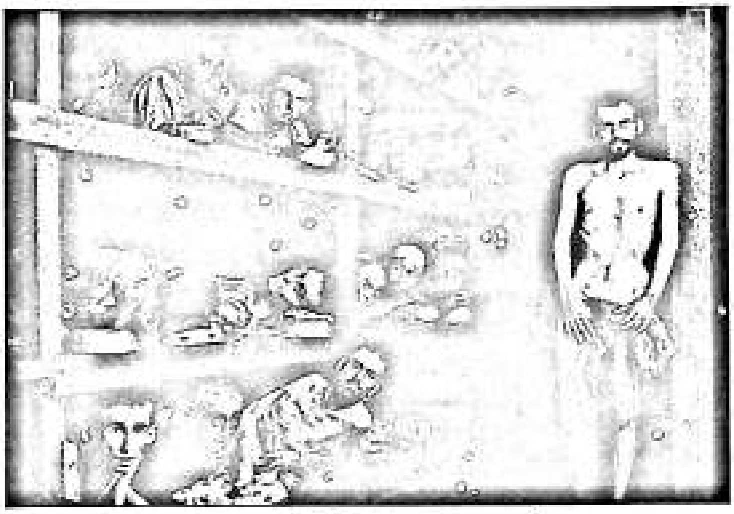

বুখেনওয়াল্ড বন্দি শিবিরে: ব্যারাকে বন্দিরা

গণহত্যায় শুধু ইহুদি নয়, অন্যান্য জাতির প্রচুর মানুষকেও হত্যা করা হয়েছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে প্রচুর সংখ্যক লালফৌজের সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, লিবারেল, জিপসী, সমকামী, বিভিন্ন জাতি, বর্ণের ও রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু হলোকাস্টের কথা যখন বলা হয় তখন এদের কথা উচ্চস্বরে বলা হয় না। কারণ, সোভিয়েতদের প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার বিরূপ ভাব, কমিউনিস্ট- সোশালিস্টদের প্রতি আমেরিকার বিরূপভাব। যেমন, গত শতকের ষাটের দশকে ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক শাসক সুহার্তোকে আমেরিকা কমিউনিস্ট ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিধনে সহায়তা করেছিল। প্রায় একলক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আশ্চর্য যে, পৃথিবীর কোথাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়নি, কেউ বিচার চায় নি। যেনো কমিউনিস্টরা মানুষ নন। ইন্দোনেশিয়ার মানুষও নিশ্চুপ। তারা বোধহয় তাদের মুসলমান আইডেনটিটি রাখতে চায় তাই কমিউনিস্ট পরিত্যাজ্য। রুয়াণ্ডায় গণহত্যার বিচার হয়েছে; কম্বোডিয়াও। প্রথমটির ব্যাপারে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের আগ্রহ ছিল কারণ তুতসিদের মধ্যে খৃস্টানদের সংখ্যা কম ছিল না। কম্বোডিয়ায় পলপট-বা খিউ সাম্পান ছিলেন চরমপন্থি কমিউনিস্ট। সেটি

বিশ্বের মোড়লদের পছন্দ নয়। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, পলপট গণহত্যা করেননি। কিন্তু সে গণহত্যা অন্য কেউ করেনি। কম্বোজরা নিজেদের গৃহযুদ্ধের শিকার হয়েছেন।

গণহত্যার পটভূমি তখনই তৈরি হয় যখন শাসক শাসন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ তার সমর্থক হয়ে ওঠে। যখন তিনি কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠেন তখন তার মনে হয়, তিনি যা করেছেন তা জাতি বা রাষ্ট্রের জন্য ভালই করেছেন এবং দমন করা-কে রাষ্ট্রের আধিপত্য ও শক্তি বিস্তারের মাধ্যম মনে করা হয় যা রাষ্ট্রের বা তার কর্তৃত্ব অটুট রাখবে। কিন্তু, বিশ্বে কখনও সে কর্তৃত্ব অটুট থাকে না। হিটলার বা ইয়াহিয়া খান এর উদাহরণ। তবে, কৌশলগত কারণে তা অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে গেলে সে সব রাষ্ট্র নির্বিকার থাকে, বিবৃতি বা জাতিসংঘে বিবৃতি দেয়া ছাড়া।

ইসরায়েলে যে আরবদের ওপর নিপীড়ন বা গণহত্যা চালাচ্ছে তা সারা বিশ্ব দেখছে। ইসলামি উম্মাহর কথা বলা হলেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলি চুপ। কারণ তা তাদের স্বার্থ বিরোধী নয়। এবং আরব রাষ্ট্রসমূহ যেহেতু আমেরিকার তাবেদার সেহেতু মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রসমূহ ইসলায়েলের সঙ্গে সমঝোতা শুধু নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কও তৈরি করেছে।

গণহত্যা শব্দটি যেহেতু সরাসরি হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে বড় অপরাধকে বোঝায় সে জন্য পাশ্চাত্য নতুন কিছু সংজ্ঞা তৈরি করেছে। আমাদের অনেক একাডেমিশিয়ান যেহেতু শ্বেতাঙ্গদের বড় একাডেমিশিয়ান মনে করেন সেহেতু তারাও আজকাল এসব

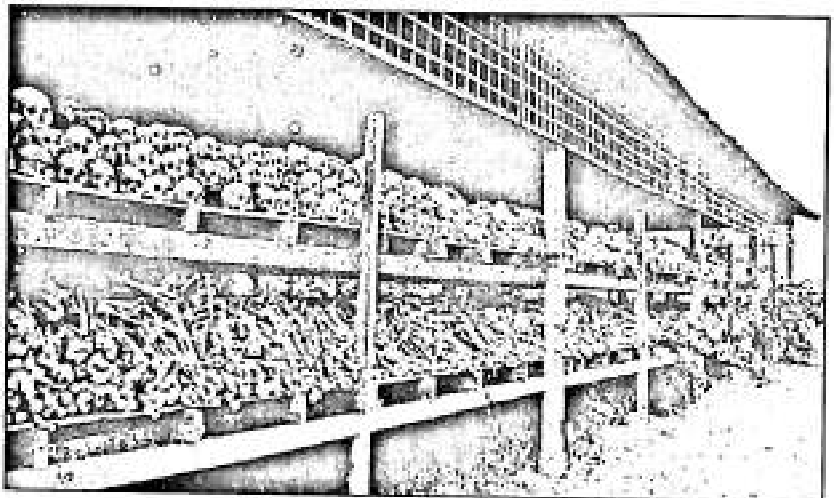

কম্বোডিয়ার গণহত্যায় নিহতদের মাথার খুলি

সংজ্ঞার ভক্ত হয়ে উঠছেন। যেমন- 'এথনিক ক্লিনজিং', 'ম্যাস ম্যার্ডার', 'ম্যাসাকার' প্রভৃতি। মিয়ানমারে যখন রোহিঙ্গা নিধন শুরু হয় তখন বিতর্ক শুরু হয় এটিকে কী অভিধা দেয়া হবে তা নিয়ে। 'এথনিং ক্লিনজিং'টাই প্রায় সবাই গ্রহণ করেছিলেন। যেন, অপরাধটা তেমন নয়, গণহত্যার মতো নয়। কিন্তু চীন ও ভারত যখন এই 'এথনিক ক্লিনজিং' সমর্থন করে তখন আমেরিকা একে 'জেনোসাইড' নামে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘসহ পাশ্চাত্যও এখন তাই বলছে।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে যেহেতু বাংলাদেশ চীন বা ভারত কারো বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না, সেহেতু রোহিঙ্গাদের দায় বাংলাদেশই বহন করতে হবে যদি না দৈবশক্তি বাংলাদেশের প্রতি পক্ষপাত করে।

৪

ইংরেজি মিউজিয়ামের বাংলা অনুবাদ কেনো জাদুঘর [বা যাদুঘর] হলো তা ভাববার বিষয়। জাদু ফার্সি শব্দ। ঘর বাংলা। জাদুর ঘর। উনিশ শতকে কলকাতায় তখন জাদুঘর গড়ে তোলা হচ্ছে তখন স্থানীয়রা একে 'আজব ঘর' বলে চিহ্নিত করেছে।[১২] নানারকম দ্রব্য যা তারা তাদের আশেপাশে দেখছে বা দেখিনি এমন সব দ্রষ্টব্য যখন এক জায়গায় জড়ো করা হচ্ছে এবং তা যখন সে দেখতে যাচ্ছে তার কাছে তা আজব মনে হচ্ছে, জাদুর খেলা মনে হচ্ছে, হয়ত সে থেকে জাদুঘরের উৎপত্তি।

জাতীয় জাদুঘর সব দেশেই আছে। জাতীয় জাদুঘর গড়ার উদ্যোগ নেয় সরকারই। কারণ, জাতীয় জাদুঘর জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং সে চিন্তার মধ্যেও এক ধরনের রাজনীতি আছে। যদি কলোনি আমলে তা গড়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে ঔপনিবেশিক শাসকরা দেখাতে চায়, তাদের অধিকারে আছে এমন কলোনি যার ইতিহাস ঐতিহ্য আছে। পরে, কলোনি থেকে মুক্তি পেলে শাসকরা এমনভাবে তা সাজাতে চাইবেন যাতে তাদের ইতিহাস বোধ প্রদর্শিত হয় এবং তার একটি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্টও থাকে। উপমহাদেশে যে কটি জাতীয় জাদুঘর আছে সবখানে এখন 'প্রফেশনাল' এর বদলে এমন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বে বসানো হয় যিনি ক্যাডার সার্ভিসের [যেমন, বিসিএস, আইএএস বা সিএসপি]। কারণ, সরকারি লোক হলে তাদের মাধ্যমে সরকারের নীতি প্রতিফলিত হবে এবং সেখানে এমন মানুষদের বসানো হয় যারা সরকারি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে না বলেন না বাইরে যে পরিচয় থাকুক না কেনো। ট্রাস্টি বোর্ড থাকে এবং তাদের কর্তৃত্ব যেন 'মহাপরিচালক' 'পরিচালক' বা কিউরেটর' থেকে কম থাকে সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

আমাদের জাতীয় জাদুঘরের কথাই বলি। খালেদা জিয়ার আমলে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের দ্রষ্টব্যের মাঝে 'জিয়া কর্ণার' করা হলো। জাদুঘরের তখন মহাপরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ইফতেখারুল আউয়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে তিনি আওয়ামী লীগ বিরোধী। বলা যেতে পারে, যে কয়জন প্রফেশনালকে মাঝে মাঝে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তিনি তার একজন। তার সময় প্রস্তাব হলো, জাদুঘরে 'জিয়া কর্ণার' করা হবে।[১৩] 'জিয়া কর্ণার' স্থাপনের উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির অবলেপন এবং জিয়া যে স্বাধীনতার ঘোষক ও অন্যতম সৈনিক তা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা। এতে কর্তৃপক্ষ সফল হয়েছিল। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার অনেক পরে, বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হলে, সেটি সরিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার করা হয়। যেমন, ভারতে এখন বৌদ্ধ, অনার্য বা মুসলমান সংস্কৃতি নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি হিসেবে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পর ঢাকা জাদুঘর [জাতীয় জাদুঘর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত] গড়ে তোলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ হাসান দানী। ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর হলেন দানী। কার্যভার বুঝে নেওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোয়াজ্জেম হোসেনকে জিজ্ঞেস করলেন জাদুঘরের সংগ্রহ সম্পর্কে [জাদুঘর তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন]। তিনি বললেন, 'মূর্তি ছাড়া আছে কিছু হলুদ আর সাদা পয়সা'।[১৪] এতে বোঝা যায় জাদুঘর একটি ছিল বটে কিন্তু এ সম্পর্কে সাধারণের দূরের কথা, এলিট দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও কোনো ধারণা ছিল না।

জাদুঘরের দখলে ছিল নিমতলির পুরনো ইমারত ও এর ফটক যেটি এখন এশিয়াটিক সোসাইটি। এই ফটকে ছিল জাদুঘরের অফিস আর পুরনো ইমারতে ছিল সংগ্রহ। সংগ্রহশালার সামনে নারকেল গাছ দিয়ে একটি বৃত্তের মতো করেছিলেন ভট্টশালী। প্রত্যেকটি গাছের নিচে ছিল একটি ভাস্কর্য, সংগ্রহশালায়ও তা ছিল আর ছিল প্রাকৃতিক ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত কিছু সংগ্রহ। অফিস ঘরে ছিল মুদ্রা ও গ্রন্থ সংগ্রহ।

দানী লিখেছেন, জাদুঘরের ঠিক উল্টো দিকে ছিল বাস্তুহারাদের বস্তি, যাদের অধিকাংশ ছিল অবাঙালি। এশিয়াটিকের কোনায় যে মসজিদটি আছে সেখানে তারা নামাজ পড়তে আসতেন। "শুক্রবার আমিও সেখানে যেতাম।" কিছুদিন পর, বললেন দানী, "আমি লক্ষ করলাম জাদুঘর তাদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় নয়। এর একটি কারণ, জাদুঘরের বাইরে মূর্তির সমাহার। [১৯৪৭ এর আগ থেকেই সেগুলি ছিল]। স্থানীয় মোল্লা

মৌলবীরাও এতে ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। আমার কাছে কয়েকবার তারা অভিযোগ করেছিলেন, মূর্তিগুলি তারা ভেঙে ফেলবেন"।

আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি হয়ত বাস্তহারা অবাঙালিদের এ অভিযোগ করতে সহায়তা করেছিল এবং স্থানীয় সাধারণ মুসলমানদের মনে তারা এ ধারণাও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। দানী দেখলেন, জাদুঘরকে ঢাকা শহরে যদি বিকশিত করতে হয় তাহলে জাদুঘর সম্পর্কে সাধারণের ধারণা পাল্টাতে হবে। সাধারণের সঙ্গে সৃষ্টি করতে হবে যোগাযোগ, বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে। বেশ কিছুদিন ভাবনা-চিন্তার পর তিনি দেখা করলেন ভিসির সঙ্গে। বললেন, "আই ওয়ান্ট টু ইসলামাইজ দি মিউজিয়াম।"

"সেটা আবার কী?"

"কিছু মুসলিম জিনিস সংগ্রহ করতে হবে।"

প্রথমে তিনি জাদুঘরের সামনের বৃত্তটা ভেঙ্গে ফেললেন, মূর্তিগুলি ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন। এতে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষোভ খানিকটা দূর হলো। এরপর তিনি ইসলামী নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এ বয়ান থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। জাদুঘর স্থবির কোনো বিষয় নয়, সময়োপযোগী করতে হয় জাদুঘরকে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা ট্রাস্টের অধীনে থাকলে নাগরিক সমাজের চাহিদা সেখানে প্রতিফলিত হয়। সরকার বিনিয়োগ করলে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি সেখানে প্রতিফলিত হয়। দানীর বয়ান থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট স্থানীয় মুসলমান ও মোহাজের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ছিল না। ভাস্কর্য বাইরে থাকলেও স্থানীয় মুসলমানরা কখনও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু, ঢাকা শহরে মোহাজেরদের আগমন স্থানীয় সমন্বয়ের সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন। ১৯৭১ সালে আমরা দেখি, পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে তারাও বাঙালি নিধনে নেমেছে।

এতোসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরও বলতে হবে, অন্তিমে জাদুঘর এক ...নের জাতীয়তাবাদের প্রতীক। বিদেশি অতিথিরা এলে বিশেষভাবে ...াদের নেয়া হয় জাতীয় জাদুঘরে, জাতির গৌরব গাঁথা দেখাবার জন্য। এর ...ধ্যে এক ধরনের গর্ববোধ কাজ করে [কর্তৃপক্ষ জাদুঘরের মাধ্যমে যে ...খ্যাই দেন না কেনো]। কিন্তু, বিশেষায়িত জাদুঘর যেমন 'মুক্তিযুদ্ধ' বা ...হত্যা জাদুঘর' সম্পর্কিত জাদুঘরের কথা উঠলেই তা সন্দেহের চোখে ...া হয়। তখন জাতীয় গর্ববোধ-এর চেয়ে সন্দেহবোধ বা রাজনীতি কাজ ...,, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে। পাশ্চাত্যেও এই বোধ কাজ করে ... সেখানে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে, সমাজেও গণতন্ত্রবোধ ... সিভিল সমাজের ভাবনা-কে শাসদের স্পেস দিতে হয়।

আমাদের দেশ দিয়েই আলোচনা শুরু করি। জাতীয় জাদুঘরে নানা বাঁক পরিবর্তনের পর এক ধরনের স্থিতিশীলতা এসেছে। তারপর নানা ধরনের ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আছে। ১৯৬৯ সালের যে চিত্রমালা আছে সেখানে, তাতে তোফায়েল আহমদ নেই। অথচ ১৯৬৯ সাল তাঁকে ছাড়া ভাবা যায় না। কিন্তু, অনুচ্চ এক রটনা কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে সরকার প্রধান তাকে পছন্দ করেন না এবং এ রটনার সত্য মিথ্যা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি।

যা হোক, এখানে ১৯৭৫ সালের পর যে জাদুঘরগুলি স্থাপিত হয়েছে প্রত্যেকটির নির্মাণে এক ধরনের রাজনীতি আছে। ১৯৭৫-১৯৯৫ পর্যন্ত সরকারি আনুকূল্যে যে জাদুঘরগুলি স্থাপিত হয়েছে তাতে রাজনীতি অবশ্যই আছে কিন্তু সেগুলি নির্মাণে কোনো প্রতিবন্ধকতা হয়নি। প্রতিবন্ধকতা হয়েছে অন্য ধরনের জাদুঘরগুলি নির্মাণে।

৫

আমাদের দেশ দিয়েই শুরু করি। জাতীয় জাদুঘর ছাড়া বাকি সব ধরনের জাদুঘর নির্মাণে এক ধরনের রাজনীতি কাজ করেছে। উদ্যোক্তাদের প্রচুর প্রতিবন্ধকতা পেরুতে হয়েছে।

যখন বিএনপির শাসন তখন জিয়া বা ওসমানীর নামে জাদুঘর হয়েছে সরকারিভাবে কারণ সেটি ছিল এক ধরনের বক্তব্য যে, মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অথচ, যিনি বাংলাদেশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন, যিনি জাতির পিতা তাঁর নামে জাদুঘর স্থাপনে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনকী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপনেও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কিন্তু, ঢাকা শহরের সবচেয়ে দামি জায়গায় সামরিক জাদুঘরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়।

এর বিপরীতে শেখ হাসিনা উদ্যোগ নিলেন বঙ্গবন্ধু জাদুঘর স্থাপনে। নিজেদের বাড়ি দান করলেন, টাকা যোগাড় করলেন এবং কোনো রকমে জাদুঘরটি স্থাপন করলেন। এখন তিনি ক্ষমতায় আসীন দেখে সরকারি সাহায্য কিছু পাওয়া যায় এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিরা এখানেই আসেন। এটিও একটি স্টেটমেন্ট যে, সিভিল সমাজের নেতাকে বিদেশি শক্তির সহায়তায় সামরিক সদস্যরা হত্যা করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সিভিল সমাজের উদ্যোগ। নিজেদের টাকা দিয়ে উদ্যোক্তারা কাজ শুরু করেন। এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকরা তাদের সাধ্যানুযায়ী এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। সামরিকায়ন ও পাকিস্তানিকরণের

Acc No 6747/16-2-22

বিপরীতে এটিও ছিল একটি স্টেটমেন্ট। বিএনপি বা জামায়াত এতে হামলা করেনি এ কারণে যে তা তাদের বিরুদ্ধে যাবে। সাধারণ মানুষের মন থেকে তো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি তখনও মুছে ফেলা যায়নি। কী ভাবে মূলধন ছাড়া একটি জাতীয় জাদুঘরের মতো জাদুঘর গড়ে তোলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার ধ্রুপদী উদাহরণ। ২০১২ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিভিল সমাজ এই জাদুঘর পরিচালনা ও বিকাশের জন্য অকাতরে অর্থ দান করেছে। বাংলাদেশের মানুষ আর কোনো স্থাপনা গড়ার জন্য মন থেকে এতো সাহায্য আর কখনও করেনি। এর অন্য অর্থ, সাধারণ মানুষের মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অবলেপন সম্ভব নয়। এখনও, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যে কোনো আবেদনে সাড়া দেন মানুষ। এবং কোনো সরকারি নির্দেশনায় নয়, ট্রাস্টিরা যে ভাবে চেয়েছেন সে ভাবেই গড়ে তুলেছেন জাদুঘর-কে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের গণহত্যার পূর্বে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে

২০১১ সালে সামরিক সরকার ক্ষমতায় এলে একজন গণপূর্ত মন্ত্রী হলেন যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে জান পেহচান ছিল তাঁর। তাঁদের আবেদনে তিনি আগারগাঁয় জমি বরাদ্দ করলেন। এতোদিন ভাড়া বাড়িতে ছিল তা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ করে দিলেন।

নতুন শতক থেকে আমাদের মনে হয়েছে, গণহত্যা-নির্যাতনের বিষয়টি সামনে আনা উচিত। কারণ, সমন্বয়ের রাজনীতির বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি বা সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে গণহত্যার বিষয়টি আনতে হবে এবং ঘাতকদের বিচারের দাবি অব্যাহত রাখতে হবে। গণহত্যা-নির্যাতনের ও ঘাতকদের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আমি আর শাহরিয়ার কবির লেখালেখি শুরু

করি। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঘাতকদের বিচারের দাবি জোরদার করে। শুধু তাই নয় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের আহ্বান জানানো হয়। প্রায় দু'দশক ২৫ মার্চ রাতে শহীদ মিনারে 'আলোর মিছিল'-এর আয়োজন করে। বলতে দ্বিধা নেই, গণমাধ্যম সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিল।

প্রশ্ন উঠেছিল, বাংলাদেশ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চেয়েছে। কিন্তু, নিজের দেশে গণহত্যা দিবস পালন করে না। ২০১৭ সালের একদিন নির্মূল কমিটির সেমিনারে রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমদ ছিলেন প্রধান অতিথি। সংসদের অধিবেশন চলছিল। জুনায়েদ আহমদ নামে এক পাকিস্তানি একটি বই লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, গণহত্যা হয়নি বরং বাঙালিরাই গণহত্যা চালিয়েছে বিহারিদের ওপর।[১৫] মন্তব্য করেছিলাম, আমাদের দেশে হাত ধোওয়া দিবস পালিত হয় অথচ গণহত্যা দিবস পালিত হয় না। এরপর তোফায়েল আহমদ বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন, 'আমি মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমারই একথাটি মনে হয়নি। সত্যিই আমি লজ্জিত।'

আমি বললাম, 'সংসদ চলছে, এখনিই গিয়ে প্রসঙ্গটি তুলুন।'[১৬]

তোফায়েল আহমদ তখনই সংসদে গিয়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংসদে আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনাসহ সবাই বক্তৃতা দেন এর সমর্থনে। সিদ্ধান্ত হয় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। ২০ বছর আন্দোলনে যা করা যায়নি, হঠাৎ একদিন অতি তা সহজেই হয়ে গেল। আমাদের যুক্তিটি ছিল, ২৫ মার্চ পালিত হলে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হবে, হত্যাকারীদের চেহারা স্পষ্ট হবে, বিচারের দাবি উঠবে, বিচার হলে হত্যাকারীরা শাস্তি পাবে এবং রাজনীতির এই অন্ধকার দিকটি উন্মোচিত হবে। হ্যাঁ, যারা পাকিস্তানপন্থি রাজনীতি করেন এ দিনটি তাদের রাজনীতিতে পেরেকাঘাত। যারা পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা পুনরুৎপাদন করতে ভালোবাসেন, তারা বলবেন এটি শাসকদের জাতীয়তাবাদী বয়ানকে শক্তিশালী করবে বলেই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী সদস্যরা তা সমর্থন করেছে। হ্যাঁ, তাই যদি হয়, তা হলে আরো আগে যখন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ তখনই এটি করতে পারত। কিন্তু করেনি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ বীরাঙ্গনা অহরহ উচ্চারিত হয়েছে। এটি বক্তৃতার একটি অংশ। ক্লিশে। এটির ভিন্ন তাৎপর্য থাকতে পারে তা তাদের মনে হয়নি। কিন্তু, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ও বক্তৃতাকালে স্মৃতির পুনরুজ্জীবন সবাইকে আবেগী করে তুলেছিল। এটি রাজনীতি হতে পারে এই বোধ তখন আসেনি। এর অন্য

অর্থ সব বয়ান রাজনীতির সুবিধার জন্য শুরু হয় তা নয়। পরে, হয়ত সম্যক উপলব্ধির পর তা রাজনীতির অন্তর্গত হয়। আর পৃথিবীর আলোচিত কোন বিষয়টি রাজনীতির অন্তর্গত নয়।

লেমকিন যে অর্থে 'জেনোসাইড' শব্দটির উদ্ভাবন করেছিলেন এখন তার পরিধি আরো বেড়েছে। স্বদেশ রায় লিখেছেন, জাতিসংঘের সংজ্ঞায় "একটি জাতি বা নরগোষ্ঠীকে বা কোনো আদর্শের লোকদের নিশ্চিহ্ন, তাদের পরিচয় পরিবর্তন ও আদর্শ পরিবর্তনের জন্য যে কোনো ধরনের হত্যা, নির্যাতন, বলপ্রয়োগ বা অন্য কোনো রূপ অত্যাচার জেনোসাইড বলেই চিহ্নিত হবে। এবং সেখানে কত লোক হত্যা করা হয়েছে বা নিহত হয়েছে সেটা বড় নয়। তার থেকে অনেক বড় হলো, ঐ হত্যা, নির্যাতন বা গৃহত্যাগে, ভূমিত্যাগে বাধ্য করার মূল কারণ। যদি এর মূল কারণ হয় ঐ জনগোষ্ঠী, জাতি বা কোনো সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করা, তাহলে সেটা অবশ্যই গণহত্যার মধ্যে পড়ে। তাই গণহত্যার সংখ্যা কখনই বড় নয়। এর উদ্দেশ্যই মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়।"[১৭]

গণহত্যা যে চালায় কখনও সে তা স্বীকার করতে পারে না, কারণ সে জানে এটি আদি পাপ এবং এর বিচার কখনও তামাদি হয় না। অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রশ্নটিও আসে। আরেকটি বিষয় সব সময় থাকে, নির্দেশ মানা হয়েছে যা নাজিরা সব সময় বলেছে। বিভ্রান্ত করা। যেমন পাকিস্তান সব সময় বলেছে, বাঙালিরা বিহারিদের হত্যা করেছে তাই সৈন্যদের বিহারিদের বাঁচাতে হয়েছে। আর আছে সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক।

বাংলাদেশে গণহত্যা ধর্ষণ নিয়ে তিনজন মহিলা তিনটি অভিসন্দর্ভ লিখেছেন। তিনজনই আদতে ভারতীয়। এরা হলেন শর্মিলা বসু, ইয়াসমিন সাইকিয়া ও নয়নিকা মুখার্জি। প্রথমজন ছাড়া বাকি দু'জন যখন ঢাকা এসেছেন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বাংলাদেশে তরুণ গবেষকরা ইন্টারনেট আসক্ত। বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে আলোচনাকালে এ তিনজনের নাম তারা উল্লেখ করেন, উদ্ধৃত করেন যেহেতু বইগুলি ইংরেজিতে লেখা। এদের তাত্ত্বিক কাঠামো ও বিশ্লেষণ যে কী বিভ্রান্তিকর এটি নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা নেই।

ইয়াসমিন বাংলাদেশের গণহত্যা নিয়ে কী লিখেছেন? তাঁর মতে, "The multiple actors and perpetrators complicate the picture and it is almost impossible to distinguish victims and perpetrators". [p. 57]

সুতরাং, এটিকে গণহত্যা বলা যায় না। যেমন বলেছেন বিদেশি গবেষকরা। তবে, নাজিরা ইহুদি নিধন করেছে সেটিকে গণহত্যা বলা যায়।

দারফুর, বসনিয়ায় যা ঘটেছে সব কিছুকে গণহত্যা বলা যায়, কিন্তু, বাংলাদেশের হত্যাকে গণহত্যা বলা যায় না। এক জায়গায় লিখেছেন, ১০ লাখ নিহত হয়েছে। ৩০ লাখ কখনও স্বীকার করেন নি। হুতু-তুতসিদের সংঘাত গৃহযুদ্ধ নয় কেনো? কিন্তু, বাংলাদেশেরটা গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ হলে গণহত্যা হবে কী ভাবে?

"No single group had a monopoly on committing violence." [p. 48]

এর অর্থ কী?

অর্থ হলো, পাকিস্তানিরা মেরেছে। পাঞ্জাবিরাও মেরেছে। কিন্তু বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের সঙ্গে লড়াই করেছে, দু' পক্ষই মারা গেছে, রাজাকার আলবদর পেলে হত্যা করা হয়েছে, কখনও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ৩০ লক্ষের বিপরীতে যদি মুক্তিযোদ্ধারা বা যুদ্ধের সময় ৪০ হাজার হানাদার, রাজাকার বা বিহারি হত্যা করতে পারত তাহলেও তক্কে পৌঁছানো যেত। কিন্তু, তাতো হয়নি। যখন ইয়াসমিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ৩০ লাখ শহিদ হয়নি তখন এ নিয়ে তর্ক করা বাতুলতা। তিনি মনে করেন, "Obviously the misguided ethnocentric and political interst to participant- Pakistani, Bengali, Bihari and even Indian led to man violence." [p. 51][১৮]

শর্মিলা বসুও মুক্তিযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ বলেছেন, শহিদ ও ধর্ষণের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের নাতনি। তার বইটিও বিদেশ থেকে প্রকাশিত, নাম– *দি ডেড রেকনিং*।

এরা বাইরের মানুষ। আমাদের নিজেদের মানুষ, কথিত 'আপসহীন' নেত্রী তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২০১৫ সালে গণহত্যায় শহিদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার একবছর পর বিএনপি নেতা গয়েশ্বর রায় তা সমর্থন করেন।[১৯] তখন শেখ হাসিনা মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করেছেন। জামায়াত নেতাদের বিচার চলছে। পাকিস্তান, তুরস্ক ক্ষুব্ধ। জামায়াত বিএনপি মিত্র সে সূত্রে পাকিস্তানেরও মিত্র। পাকিস্তানি ভাবধারায় তারা প্রভাবান্বিত। জামায়াত ব্যাপকভাবে লবিং করছে। ড. কামাল হোসেনের কন্যার জামাতা ডেভিড বার্গম্যান এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। লেখালেখি শুরু করলেন। খালেদা জেনারেল জিয়ার পত্নী, পাকিস্তানি প্রভাবে আচ্ছন্ন। ১৯৭১ সালে যে পাকিস্তানি জেনারেলের জিম্মায় ছিলেন, তার মৃত্যুতে, প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন সব ধরনের রাষ্ট্রাচার উপেক্ষা করে। ড. কামাল আওয়ামী লীগ বিরোধী। অর্থাৎ,

এই যে গণহত্যার সংখ্যা অস্বীকার ও তা নিয়ে বিতর্ক তোলার মূল কারণ মতাদর্শ। গণহত্যা চালানোর তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি মতাদর্শ, তা অস্বীকারের ভিত্তিও মতাদর্শ।

কোনো গণহত্যারই নির্দিষ্ট সংখ্যা কখনও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব গণহত্যার সংখ্যা দেয়া হয়েছে তার সবগুলিই আনুমানিক। এই অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষভাবে দেখা। বিভিন্ন প্রতিবেদন, অভিজ্ঞতা। যে দেশ-জাতি গণহত্যার যে সংখ্যা নিরূপন করে তা মোটামুটি এ কারণে মেনে নেয়া হয়।

কম্বোডিয়া থেকে রুয়ান্ডা বা জার্মানি থেকে ইন্দোনেশিয়া–কোথায় গণহত্যার চুলচেরা হিসাব দেয়া হয়েছে? সুহার্তো ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট সন্দেহে লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছেন যা গণহত্যা। সেটি মানা না মানা অন্য কথা, কিন্তু সুহার্তো কী পরিমাণ হত্যা করেছেন সেটিই মূল বিষয়। ধরা যাক, কেউ বললেন বাংলাদেশে ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৯১ জন মারা গেছেন? তাতে কি প্রমাণিত হয় বাংলাদেশে গণহত্যা হয়নি বা যারা গণহত্যা চালিয়েছে বা গণহত্যাকারীদের সমর্থন করেছেন তাদের দায় কম?

এরপর আসে ধর্ষণের প্রশ্ন। গণহত্যার সঙ্গে নির্যাতনের প্রশ্নটিও জড়িত। ধর্ষণকে অবশ্যই নির্যাতনের অংশ বলা যায়। মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণকেও মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিষয়টি একারণে গুরুত্বপূর্ণ। গণহত্যার সঙ্গে নির্যাতনের বিষয়টি আসা দরকার যে কারণে খুলনায় স্থাপিত জাদুঘরের নাম 'গণহত্যা-নির্যাতন'। সেখানে নির্যাতিত নারীদের সম্পর্ক দ্রষ্টব্যও প্রদর্শিত হচ্ছে।

৬

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম অনেক পাকিস্তানির বিষয়ে আলাপ করেছি বিভিন্ন জনের সঙ্গে। এদের মধ্যে একজন হলেন– এম. এ নকভী। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত কলামিস্ট। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে নকভী অকম্পিত স্বরে বললেন, পাকিস্তানি বাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল, লুটেরা বাহিনী, এরা লুট করেছে। ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব রকমের অপরাধ করেছে। এ সেনাবাহিনী কত বোধহীন ছিল তার প্রমাণ জেনারেল টিক্কা খানের ঢাকা থেকে ফেরার পর সাংবাদিকরা যখন লুট, হত্যা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ধর্ষণের সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। "মাত্র তিন হাজার, মাত্র তিন হাজার মহিলা

ধর্ষিত হয়েছে। ক্রোধে নকভীর গলার স্বর কাঁপছিল, টিক্কা, ইয়াহিয়া, নিয়াজি, ভুট্টো সবাই এর সঙ্গে যুক্ত।"[২০] তিনি আরো বলেছিলেন, নিজ দেশের সৈন্য যদি নিজ দেশের একজন নারীকেও ধর্ষণ করে তাহলেও সেটি জঘন্য এক অপরাধ।

পাকিস্তানি এই নীতির কথা বলেছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় ঔপন্যাসিক মুলক রাজ আনন্দ। ১৯৭২ সালে তিনি যা বলেছিলেন তার মূল কথা হলো "নতুন একটি জাতি সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিরা এই নীতি গ্রহণ করেছিল।"[২১] যে নীতি আমেরিকা গ্রহণ করেছিল ভিয়েতনামে যার কথা আগে উল্লেখ করেছি।

"[Rapes were so systematic and pervasive that they had to be conscious Army policy. Planned by the West Pakistanis in a deliberate effort to create a new race or to dilute Bengali nationalism.]"

যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ডা. ডেভিস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন—

"প্রশ্ন: তারা নারী ধর্ষণের ব্যাপারটা কীভাবে জায়েজ করার চেষ্টা করেছে?

জেফ্রি: ওরে বাপস! তাদের ওপর টিক্কা খানের এক প্রকার আদেশ বা নির্দেশই ছিল যে, একজন সাচ্চা মুসলমান তার বাবা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই লড়াই করবে। কাজেই তাদের যা করতে হবে তা হলো যতোটা পারা যায় বেশি সংখ্যক বাঙালি নারীকে গর্ভবতী করা। এটাই ছিল তাদের কাজের পেছনের তত্ত্ব।"[২২]

বীরাঙ্গনা গ্রন্থে আমি যে সব কেস স্টাডিগুলির বর্ণনা করেছি তাতে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। দেখা যাবে, ধর্ষণগুলির একটা প্যাটার্ন আছে। তবে যে বিষয়টি স্পষ্ট, তাহলো পাকিস্তানের দমন নীতির একটি হাতিয়ার ছিল ১. ধর্ষণ ২. ধর্ষণের মাধ্যমে 'নতুন জাতির সৃষ্টি' যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে; ৩. কলোনির অধস্তন মানুষ হিসেবে যেনতেন ব্যবহার। যেন মানুষ মানুষ নয়, সামগ্রী মাত্র; ৪. জৈব আকাঙ্ক্ষা মেটানোর রাস্তা এবং এক রকম প্রতিশোধ স্পৃহা প্রথম ও দ্বিতীয়টির সম্পূরক।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের কতজন ধর্ষিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরপর আমরা নানা হিসাব পেয়েছি। এখন হিসাবটা চার লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ডা. ডেভিসও এই সংখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক ধর্ষিতার

কথা বাইরের পৃথিবীতে জানাজানি হলে তখন বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার ডা. জিওফ্রে ডেভিসকে বাংলাদেশে পাঠায়। তিনি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ধর্ষিতাদের নিয়ে কাজ করেছেন। তৎকালীন সরকারি কর্মচারীরা যে হিসাব দিয়েছেন, ডা. ডেভিস জানিয়েছিলেন তা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন, "সরকারি কর্মকর্তরা বাংলাদেশের জেলাওয়ারি হিসাব করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০টি পাকিস্তানি সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে দুজন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লাখ। এই সংখ্যাকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল অঙ্করূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।" ডা. ডেভিস মনে করেন এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মতো হবে।[২৩]

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, ধর্ষিতা ও নির্যাতিতদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি। *নিউজউইকের* একটি প্রতিবেদনের কথা ধরা যাক উদাহরণ হিসেবে। ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর পত্রিকাটি লিখেছিল, মুক্তিবাহিনীকে দমন করবার নামে কিছুদিন আগে পাক সেনারা ডেমরা নামে এক গ্রামে অভিযান চালায় (যেখানে মুক্তি বাহিনীরা আদৌ ছিল না)। তারা ১২ থেকে ৩৫ বছরের সমস্ত মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং গুলি করে মারে ১২ বছরের বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষদের।[২৪]

ডা. ডেভিস এ পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন–

"প্রশ্ন: পাকিস্তানের অসংখ্য নথিপত্রে এখনও বলা হয়, ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা হচ্ছে আপনি কি তাদের এ দাবি সত্য মনে করেন?

জেফ্রি: না, না...তারা ধর্ষণ করেছে। সম্ভবত তারা প্রকৃতই যা করেছে, তার তুলনায় অনেকগুণ কম সংখ্যা দাবি করা হয়। তারা যে পদ্ধতিতে শহর দখল করতো তার বিবরণ খুব কৌতুহলোদ্দীপক। তারা তাদের পদাতিক বাহিনীকে পেছনে রেখে গোলন্দাজ বাহিনীকে সামনে নিয়ে আসতো। তারপর হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ গোলা ছুঁড়ে গুঁড়িয়ে দিতো। এর ফলে শহরে নেমে আসতো চরম বিশৃঙ্খলা। আর তারপর পদাতিক বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ে মেয়েদের বেছে বেছে আলাদা করতো। শিশুরা ছাড়া যৌনভাবে ম্যাচিওরড সকল মেয়েকে তারা একত্রে জড়ো করতো। আর শহরের বাকি লোকজনকে বন্দি করে ফেলতো পদাতিক বাহিনীর অন্যরা। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হতো। আর তারপর মেয়েদের পাহারা দিয়ে কম্পাউন্ডে নিয়ে এসে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া

হতো। অত্যন্ত জঘন্য একটা ব্যাপার ছিল এটা। বিশ্বের কোথাও কখনও এমন ঘটনার নজির পাওয়া যায় না। তবুও, এমনটাই ঘটেছিল।"[২৫]

হ্যাঁ, যুক্তির খাতিরে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের ৬৪ হাজার গ্রামে তো পাকিস্তানি সৈন্যরা যায়নি। কথাটা ঠিক, ৬৪ হাজার গ্রামে পাকিস্তানি সৈন্যরা যায়নি, কিন্তু যেসব গ্রামে গেছে সেখানেই মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। আমরা এখানে যে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছি তাতে একটি প্যাটার্ন ফুটে উঠেছে। তাহলো গ্রামে গ্রামে তারা সুনির্দিষ্টভাবে মেয়েদের জন্য হানা দিচ্ছে, শহরাঞ্চল থেকে মেয়েদের উঠিয়ে নিচ্ছে, সে এক ভয়াবহ অবস্থা। অনেক জায়গায় রাজাকার বা শান্তি কমিটির সদস্যরা মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। ধর্ষিতা নারীদের একটি অংশ আত্মহত্যা করেছে, মেরে ফেলা হয়েছে। একটি অংশের পরিবার পরিজন ধর্ষণের কথা কখনো স্বীকার করেনি সামাজিক কারণে। ফলে, সঠিক সংখ্যা কখনো জানা যাবে না। সরকারি কর্মচারীরা তখন নানাবিধ কারণে ধর্ষিতার সংখ্যা কম করে দেখাতে চেয়েছে। এর পেছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে তাহলো এক ধরনেরঅপরাধবোধ। কারণ, এই মেয়েদের রক্ষার দায়িত্ব আমরা যে কোনো কারণেই হোক পালন করতে পারিনি। অনেকের কাছে এটি লজ্জার বিষয় মনে হয়েছে। এই মানসিকতার সমাজতাত্ত্বিক কারণ কী তা আমি জানি না। যে কারণে, এখনো নারী ধর্ষণের বিষয়টি পারতপক্ষে কেউ আলোচনায় আনতে চান না।

ডা. ডেভিস আরো উল্লেখ করেছিলেন, "হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেওয়ার সময় যে সব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকর্ড ব্যর্থ হয়েছে। পৌনঃপুনিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী অনেক তরুণীকে তাদের শিবিরে নিয়ে যায়। এসব রক্ষিতা তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে নয়ত হত্যা করা হয়েছে।"[২৬]

সুসান ব্রাউনমিলার লিখেছেন : "Rape in Bangladesh had hardly been restricted to beauty... girls of eight and grandmothers of seventy- five had been sexually assaulted."[২৭] পাকিস্তানিরা স্থানিকভাবেই শুধু ধর্ষণ করেনি, শত শত নারীকে মিলিটারি ব্যারাকে নিয়ে আটকে রেখেছে রাতে ব্যবহারের জন্য।

"Some women may have been raped as many as eight times in an night. How many died from this atrocious treatment, and how many more women were murdered as part of the

generalized campaign of destruction and slaughter, can only be guesses at."[২৮]

ডা. হাসান তাঁর গ্রন্থে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে ধর্ষিতার সংখ্যা দুই থেকে চার লক্ষের কথা বলা হয়েছে। তাঁর নিজের জরিপের উল্লেখ করে লিখেছেন, "১৯৯১-২০০২ সাল পর্যন্ত দেশের ৪২টি জেলার ২৫টি থানায় পরিচালিত আমাদের গবেষণায় গৃহীত অসংখ্য সাক্ষাৎকারের মধ্য থেকে নির্বাচিত ২৬৭ জন ব্যক্তির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে একাত্তরে দুলাখ দুহাজার জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন ওই সব স্থানে।... সারা দেশে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা নারীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখের ওপরে।"[২৯]

তিনি অবশ্য ধর্ষিতা ও নির্যাতিতাকে আলাদা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যই বলে দেয়, এটি সারা দেশের জরিপ নয়, সাক্ষ্যও সম্পূর্ণ নয়। তবুও ধর্ষণের ব্যাপকতাটা বোঝা যায়।

এরপরে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনা আক্ষরিক অর্থে ধরলে তাঁর দেওয়া সংখ্যাই ছাড়িয়ে যাবে। তিনি লিখেছেন পূর্বতন সিলেটে ৩০ হাজার বীরাঙ্গনার সন্ধান পেয়েছেন। "এ অঞ্চলের চা বাগানগুলির মহিলা শ্রমিক, তাদের যুবতী ও কিশোরী কন্যাগণ মনিপুরী ও খাসিয়া মহিলারা ব্যাপক হারে নির্যাতনের শিকার হন। সিলেট শহর, বালাগঞ্জের বুরুঙ্গা, আদিত্যপুর, শ্রী রামসী, শেরপুর, পীরপুর, পীরনগর, করিমগঞ্জ সীমান্ত ও হাওড় এলাকা, সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকা, মৌলভীবাজার শহর, রাজানগর, সাধুহাটি, কমলগঞ্জ থানার শমসের নগর, মনিপুরীদের বিভিন্ন থানার *গ্রামগুলির* প্রতিটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে পাকিরা অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ করে। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর থানার ছাব্বিশাসহ বিভিন্ন গ্রাম, বরিশালের গৌরনদী থানার প্রায় সবগুলি গ্রাম, আগৈলঝড়ার রাজিহার, চেতনার কোলা গ্রামসহ সমগ্র বরিশালে পাকিরা ব্যাপক নির্যাতন চালায়। পটুয়াখালি শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়ি, জেলখানা এবং এই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ব্যাপক নির্যাতন চালায়।" এ ছাড়া তিনি ফরিদপুর জেলারও বিভিন্ন থানার বেশ কিছু গ্রামের নাম দিয়েছেন যেখানে ব্যাপকহারে ধর্ষণ করা হয়।[৩০] একটি শহরের প্রতিটি বাড়িতে হানা দিলে ধর্ষিতার সংখ্যা কত দাঁড়ায়?

আগে উল্লেখ করেছি শুধু খান সেনারা নয়, তাদের সহযোগী রাজাকার ও শান্তি কমিটির লোকজনও ধর্ষণ করেছে। ব্রাউনমিলার সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রাতে পাকিস্তানি সৈনিক ও রাজাকাররা গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েদের তুলে নেয়। কাউকে কাউকে স্থানিকভাবে ধর্ষণ করা হয়। বাকীদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩১]

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস জানিয়েছিল—

"জানা যায়, পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্যাপক ধর্ষণ চালিয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী এবং কম বয়সী মেয়েদের ওপর। অসংখ্য সূত্র থেকে ঘটনা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দাবী করেছে যে, ৭০,০০০ এর বেশি নারী এসব ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সঠিক সংখ্যা যাই হোক না কেন, মার্কিন ও ব্রিটিশ শল্য চিকিৎসকরা গর্ভপাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে এসব ধর্ষিত নারীকে সমাজে গ্রহণ করার প্রচারণায়। এসব অবস্থা সাক্ষ্য দিচ্ছে ধর্ষণের বিশাল সংখ্যার। পাকিস্তানী অফিসাররা এসব বর্বরতা সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করে দায়মুক্ত থাকতে চায়। বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু এসব সেনা অফিসার নিজেরা যুবতী মেয়েদের ধরে এনে আটক রাখতো নিজেদের যৌন সন্তুষ্টির জন্য।"[৩২]

যে সব সাংবাদিক তখন রিপোর্ট করছিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রতিবেদনেও প্রসঙ্গটি এসেছে বারবার। এ রকম চারজনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি—

নিউজউইকের সাংবাদিক টনি ক্লিফটন উল্লেখ করেছেন, "আমি দেখতে পাই যে, আক্ষরিক অর্থে মানুষ বোবা হয়ে গেছে, যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের চোখের সামনে বাচ্চাদের হত্যা করেছে এবং মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ভয়ঙ্কর যৌন পরিতৃপ্তির জন্য।... পূর্ব পাকিস্তানে শত শত মাইলাই এবং লেডিসির মতো নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

নিউজউইকের সিনিয়র সম্পাদক অ্যারনাউড ডি ব্রোচগ্রেভ:"পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্রোহীদের খুঁজতে আসার ভান করে ডেমরা গ্রাম ঘেরাও করে। তারপর ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সকল নারীকে ধর্ষণ করে এবং ১২ বছরের বেশি বয়সী সকল পুরুষকে হত্যা করে।"[৩৩]

নিউইয়র্ক টাইমসের সিডনি এইচ, শোনবার্গ:"পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই বাঙালি মেয়েদের যৌনদাসী হিসেবে আটক রেখেছে। সৈন্যদের বাংকারগুলিতে এসব মেয়েদের সারাক্ষণই নগ্ন অবস্থায় রাখা হতো। ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণের পর এসব নারীর অধিকাংশেরই ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।"[৩৪]

জন হেস্টিংস নামে এক মিশনারী বলেছিলেন, "পাকিস্তানি সৈন্যরা... মেয়েদের যোনিপথে বেয়নেট ঢুকিয়ে তাদের হত্যা করেছে।"[৩৫] মেয়েদের মসজিদে আটকে রেখেও ধর্ষণ করা হয়েছে। সাতক্ষীরার একটি গ্রামের

মসজিদ থেকে বেশ কিছু নগ্ন নারী উদ্ধারের পর এ ধরনের ঘটনা নজরে আসে।[৩৬] এ সমস্ত কিছু বিবেচনায় নিয়ে বলা যেতে পারে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ছয় লাখের কাছাকাছি হতে পারে বা তার চেয়েও বেশি কিছু বেশি, কম নয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন জাপানিদের অধীনে ছিল। সেখানে পাঁচ বছরে তারা প্রায় দুই লক্ষ নারী ধর্ষণ করে।[৩৭] এসব দেশগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনা করলে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বোঝা যাবে। বিশ্বের ইতিহাসে ও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। আট মাসে রক্ষণশীল হিসেবে সাড়ে চার লাখের ওপর ধর্ষণ।

আরেকটি হিসাবে জানা যায়, ছয় বছরব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে "গোটা ইউরোপে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বাহিনী সম্মিলিত ভাবেও এত বেশি নারীকে ধর্ষণ করেনি।"[৩৮] এ সমস্ত বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পাঁচ লক্ষেরও বেশি নারী ধর্ষিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের ধর্ষিতাদের নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন শর্মিলা বসু একটি প্রবন্ধে [পরে তার এ ধরনের আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।] প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল মুম্বাইয়ের বিখ্যাত পত্রিকা *ইপিডব্লিউ*-তে। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হলো, সম্পাদক এটি ছাপলেন কীভাবে? এটি শুধু মিথ্যাচার- ই নয়, পুরো একটি জাতিকে আঘাত করা। *ইপিডব্লিউর* প্রতিষ্ঠাতা শচীন চৌধুরী বেঁচে থাকলে এই অনাচার সম্ভব হতো না। আগেই বলেছি, আগে হলে এসব লেখালেখি উপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন করা যাবে না কারণ এ প্রবন্ধ পুরো একটি জাতির বিরুদ্ধে।

গবেষকরা কোনো প্রবন্ধ পড়ার আগে তার উৎস দেখেন। শর্মিলার প্রবন্ধের ধরনটা অ্যাকাডেমিক। তাই উৎস দেখলাম। [এখানে বলে রাখা ভালো, উৎসের দৈর্ঘ্যের ওপর প্রবন্ধের মান নির্ভর করে না]। তার প্রবন্ধের নাম বেশ দীর্ঘ, ১৪ টি শব্দের শিরোনাম। আজকাল পাশ্চাত্যে এ ধরনের একটা ফ্যাশন হয়েছে, এক্সোটিক সব শিরোনাম ব্যবহার করা। শিরোনাম দিয়ে একটা অ্যাকাডেমিক ভাব আনা। শর্মিলা বোসের প্রবন্ধের নাম– 'লুজিং দ্যা ভিকিটিম : প্রবলেমস অব ইউজিং উইম্যান অ্যাজ উইপনস ইন রিকাউন্টিং দি বাংলাদেশ ওয়ার।' উৎসের মধ্যে আছে, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্রের* ৮ম খণ্ড, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত একটি সংকলন, শর্মিলার নিজের একটি প্রবন্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের একজন গবেষকের একটি বই, লন্ডনের জামায়াত ভিত্তিক প্রকাশনার একটি বই আর

পাকিস্তানের একটি। এর মধ্যে আছে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত শ্বেতপত্র ও পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রধান জেনারেল নিয়াজি ও আরেকজন পাকিস্তানি জেনারেল মিঠা, তার নেয়া সাক্ষাৎকার। এসব সূত্র তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এই উৎস বিশ্লেষণ করলে শর্মিলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

১. শর্মিলার প্রবন্ধের মূল দৃষ্টি ১৯৭১ সালের ধর্ষিতা নারী। তার বক্তব্য, বাংলাদেশের লেখক/গবেষক ও তাদের সমর্থক বিদেশি গবেষক/লেখকদের মতে, বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ লাখ। আসলে সংখ্যা কয়েক হাজার। তবে এর মধ্যে বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত বিহারি নারীও আছে। অর্থাৎ ধর্ষিতা বাঙালি নারীর সংখ্যা আরো কম। এবং এগুলি যুদ্ধজাত নয়। তার ভাষায়–
   "The available evidence confirms the occurrence of rape but does not support claims of hundreds of thousands of women raped by the army in East Pakistan in 1971. The seven case studies in Neelima Ibrahim's book, the opportunistic raped admitted by the army and the reports of massacres of non-Bengali (West Pakistan and Bihari) men. Women and children by Bengalis, suggest the several thousand women may have been victims of sexual violence in 1971."
২. বাংলাদেশের লেখালেখিতে যে সব ধর্ষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, সেগুলি অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত। উদাহরণ হিসেবে তিনি রাবেয়া, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী ও চম্পা নামে একটি মেয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের ভাষ্য মিথ্যা এবং প্রিয়ভাষিনী তো স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন ধর্ষিত হওয়ার জন্য [কারণ তিনি পালাননি]।
৩. পরিকল্পিত ধর্ষণের কোনো নীতি পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রহণ করেনি। ধর্ষণ কিছু হয়েছে তবে সেগুলোর সঙ্গে সবাই জড়িত– পাকিস্তানি সৈন্য, বাঙালি, বিহারি সব। এবং এগুলি হচ্ছে "opportunistic sexual crimes in times of war" কারণ, পাকিস্তানি সৈন্যরাতো ভদ্র, পেশাদার।
৪. বাঙালিরা বিহারিদের হত্যা করে 'এথনিক ক্লিনজিং' চালিয়েছিল।

শর্মিলা লিখেছেন, ধর্ষণের বিষয়টি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর। কত ধর্ষণ হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। অনেক চিৎকার করে এসব কথা বলে 'শত্রু' কে নিন্দিত করতে চায়। উদ্দেশ্য, 'ভিকটিমহুডকে' মহিয়ান

করা আদর্শের খাতিরে এবং ক্ষতিগ্রস্থ [অর্থ্যাৎ ধর্ষিত] যারা তাদের প্রতি কোনো 'কনসার্ন' নেই [অর্থাৎ আসল ক্ষতিগ্রস্থরা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন] তা প্রমাণ করা।

সত্যি বলতে কী এ ধরনের প্রবন্ধ এই প্রথম পড়লাম। পাকিস্তানিরাও এভাবে নিজেদের পক্ষালম্বন করেনি। ১৯৭১ সালে ৩৬ জন পাকিস্তানি নীতি নির্ধারকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি [উদাহরণ *সেই সব পাকিস্তানি* ও *পরাজিত জেনারেলদের চোখে মুক্তিযুদ্ধ*]। তারা গণহত্যা ধর্ষণকে নানাভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন কিন্তু এ ভাষায় লেখেন নি বরং ছিলেন অ্যাপলোজেটিক।

শর্মিলার বিবরণের কিছু নমুনাও উল্লেখ করতে হয়। আগাগোড়া মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বলেছেন 'গৃহযুদ্ধ'। লিখেছেন, গৃহযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটির মতো। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। ডিসেম্বরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ হাজারে। সশস্ত্র সিভিল পুলিশ ও অসৈন্যের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। সুতরাং ৩৪ হাজার সৈন্যের পক্ষে একটি দেশ পরিচালনা করে, যুদ্ধ করে এত ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। তার মতে, হামুদুর রহমান কমিশনের প্রধান একজন বাঙালি বিচারপতিও তা স্বীকার করেছেন।

শর্মিলা বাংলাদেশে এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করেছেন। অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তারা যুদ্ধের কথা বলেছেন, হত্যার কথা বলেছেন কিন্তু ধর্ষণের কথা বলেননি। তার মানে, পাকিস্তানিরা মহিলা ও শিশুদের টার্গেট করেনি। তার ভাষায়, "...Women were not harmed by the army in these events except by chance such as in crossfire. The pattern that emerged from these incidents was that the Pakistan army targeted adult males while sparing women and children." অবশ্য তিনি এও স্বীকার করেছেন, অন্যখানেও কেউ ধর্ষিত হতে পারে, মহিলা ও শিশুদেরও সৈন্যরা ক্ষতি করতে পারে। বিহারিদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তানি শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তার মাঠ পর্যায়ে গবেষণায় তার সত্যতা মিলেছে। পাকিস্তানি সেনা অফিসাররাও তাকে একই কথা বলেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও পেয়েছে।

রাবেয়া খাতুন ধর্ষিতা, সাধারণ অথচ তার বয়ান শিক্ষিতের। আখতারুজ্জামান মণ্ডল তার বইতে গণধর্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ঠিক নয়। নয়নিকা মুখার্জি এ সংক্রান্ত যেসব গবেষণা করেছেন তাতেও এসব

সমস্যা সম্পর্কে লিখেছেন তবে তার মতামত বাঙালিদের কাছাকাছি। ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদিতে কোনো নারী আটকে [কমফোর্ট উইমেন] রাখা হয়নি। তারা ভাষায় "The allegation that the army maintained 'comfort women'- even the numbers were nowhere close the Bangladeshis claim is a serious charge and merits further inquiry." নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর *আমি বীরাঙ্গনা বলছি* তে যাদের কথা আলোচনা করেছেন তাদের অধিকাংশ বাঙালিদের দ্বারা ধর্ষিত যাদের পরে মিলিটারিদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এরা অপহৃত হয়েছেন। পাকিস্তানিরা যদি এদের কিছু না করে থাকে তবুও এদের 'ধর্ষিতা' বলা যায়। ইত্যাদি।

শর্মিলা বসুর প্রতিটি লাইনের বিরুদ্ধেই তথ্য প্রমাণসহ প্রতিবাদ করা যায় কিন্তু আমি তা না করে কিছু উদাহরণ দেব মাত্র।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনদেশের দলিলপত্রে আত্মসমর্পণকারী সৈন্য ও সহযোগীর সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে ৯০,৩৬৮ জন। শর্মিলা কি বলবেন তার হিসাবের বাইরে ৬০ হাজার সৈন্য ও সহযোগী এল কোথা থেকে? রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির সদস্য সংখ্যা জানা যায়নি। এদের সংখ্যা ১১ হাজারের বেশি ছিল এবং অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র। সৈন্যরা দেশ চালায়নি। চালিয়েছে অবরুদ্ধ দেশের এবং পাকিস্তানের সিভিল প্রশাসনের মানুষজন। একটি দেশের সবাই যুদ্ধে যেতে পারে না বা পালাতেও পারে না। এই প্রশাসনের অনেকেই আবার সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী জামায়াত, মুসলিম লীগ, রাজাকার, আলবদররা ছিল ঐ বাহিনীর সশস্ত্র সহযোগী। হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ সবাই মিলে করেছে। এর অর্থ এ নয় যে এরা সবাই ধর্ষণ করেছে। একটি সৈন্য একাধিক জায়গায় একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। সশস্ত্র ব্যক্তির সংখ্যা যদি দেড়লাখের মতো হয় তা হলে ২ লক্ষ ধর্ষণ সম্ভব কিনা? রুয়ান্ডাতে ১০০ দিনে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ ধর্ষিত হলো কিভাবে? এ সংখ্যাতো পাশ্চাত্যের বিশ্লেষকদের দেয়া।

পাকিস্তানিরা পরিকল্পিত ধর্ষণ করেছিল কিনা বা যত্রতত্র নারী ধর্ষণে মেতে উঠেছিল কিনা আমি সে সম্পর্কে কিছু তথ্য দেব এবং কোনো বাঙালির তথ্য উল্লেখ করব না কারণ বাঙালিদের তথ্য শর্মিলা বোসের পছন্দ নয়। উল্লেখ্য বোস নিজের বিশ্লেষণের জন্য এসব তথ্য ব্যবহার করেছেন। নিয়াজি একটি মেমোতে লিখেছিলেন, 'আমি চাই সব সৈন্য শৃঙ্খলার প্রতীক

হবে।' তারা 'কোড অব অনার মানবে' কারণ তারা 'জেন্টেলম্যান অ্যান্ড অফিসারস।'

নিয়াজির এটি মেমোর উল্লেখ করছি যেখানে তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক হত্যা, লুট ও ধর্ষণের কথা বলেছেন। তার ভাষায়– "Since my arrival, I have heard momentous reports of troops indulging in loot and arson, killing people at random and without reason in areas cleared of the anti-state elements; of late there have been reports of rape and even the West Pakistanis are not being spared; on 12 April. two West Pakistani women were raped, and an attempt was made on two others." শুধু তাই নয় সৈন্যরা ফেরত যাবার সময় লুটের মালও নিয়ে যাচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করছে। তার ভাষায়, "I gather that even officers have been suspected of indulging in this shameful activity and what is worse, that in spite of repeated instructions, *combo* have so far failed to curb this alarming state of indiscipline and shielding such criminals."[39] সেনাপতি নিজেই তার সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খল ক্রিমিনাল বলেন আর শর্মিলা ইঙ্গিত করেন তারা 'জেন্টেলম্যান'। শর্মিলা বোস, কোনো দেশে দক্ষ ও পেশাদার বাহিনী সিভিল সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বছরের পর বছর ক্ষমতা দখল করে রাখে? বা নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে, শাস্তি দেয়, লুট করে ধর্ষণ করে?

পরিকল্পিত ধর্ষণ হয়নি? তবে, মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের ১ মার্চের টেলিগ্রাম দেখুন– "Six naked female bodies at Rokeya Hall Dacca U. Feet tied together. Bits of rope hanging from ceiling fans. Apparently raped. Shot and hung by their heels form fans."[40] শর্মিলা যদি ভারত থেকে প্রকাশিত পত্র- পত্রিকাগুলি দেখতেন তা' হলে এরকম অনেক বর্ণনা পেতেন। অবশ্য কলকাতার পত্রিকাওতো বাঙালিদের, সেগুলি কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? পাকিস্তানিদের হলে না হয় কথা ছিল।

আচ্ছা পাকিস্তানিদের ভাষায়ই বর্ণনা করি। ঐ সময় আলমদার রাজা ছিলেন ঢাকার কমিশনার। তিনি একটি বই লিখেছেন যাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের অহরহ মানুষ ধরে নিয়ে হত্যার বর্ণনা আছে। হামুদুর রহমান কমিশনের বিবরণ প্রকাশিত হলে তিনি এর বিরুদ্ধে একটি রিট করে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছিলেন। ইসলামাবাদে তিনি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, রিটের নবায়ন কালে "আমি বলছিলাম

একটি ঘটনার কথা। চার সৈনিক হামলা করেছে এক বাসায়। বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। কন্যাটি অল্প বয়সী, সে হাতজোড় করে করে তাদের জানাল যে, সে মুসলমান, তাকে যেন তারা বোনের মতো দেখে। তারপরও যখন তারা এগিয়ে আসছে তখন সে বলল, আমিওতো পাকিস্তানি। তোমাদের কারও হয়ত আমার মতো মেয়ে আছে। তাও তারা মানছে না। তখন সে বিছানার পাশে কোরান শরীফ রেখে বলল, আমার যদি কিছু করতে চাও তাহলে এই কোরান ডিঙ্গিয়ে করতে হবে। তারা কোরান ডিঙ্গিয়ে ছিল। আমি যখন আদালতে এ বর্ণনা দিচ্ছি তখন সারা আদালত স্তব্ধ। আর বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করছেন বারবার, আপনি যা বলছেন তা কি সত্যি? তাঁর চোখের পানি।"[৪১]

কমফোর্ট উইমেনের কথা বলছেন? যুক্তরাষ্ট্রের টাইম পত্রিকা জানিয়েছিল অক্টোবরে (২৫ অক্টোবর) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৫৬৩ জন নারীকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের অনেকে গর্ভবতী। অনেককে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। কাউকে কাউকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। শর্মিলা অবশ্য এই বর্ণনা পড়লে লিখতেন পাঞ্জাবী সৈন্যরা 'জেন্টেলম্যান' দেখেইতো তাদের ছেড়ে দিয়েছে। *টাইমের বয়ান-*

"One of the most horrible revelations concerns 563 young Bengali women, some only 18, who have been held captive inside Dacca's dingy military cantonment since the first days of the fighting. Seized from Dacca University and Private homes and forced into military brothels, the girls are three to five months pregnant. The army is reported to have enlisted Bengali gynecologists to abort girls held at military installations. But for those at the Dacca cantonment it is too late for abortion the Military has began freeing the girls a few at a time, still carrying the babies of Pakistani soldiers."

সবশেষে একটি কথা বলি, শর্মিলা সবসময় মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানি সৈন্যপ্রেমী এই মহিলার জ্ঞাতার্থে বলি, গত শতকে বাংলাদেশই বিশ্বের একটি দেশ যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং জয়ী হয়েছিল। তাই তাত্ত্বিকভাবেও এটিকে গৃহযুদ্ধ বলা সমীচীন নয়। এতে একটি রাষ্ট্রের জন্মকেই অপমান করা হয়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা পাকিস্তান শুধু ভাঙেনি পাকিস্তানকেও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পাকিস্তানি সিভিল সমাজকে [যাদের অনেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে জেলে পর্যন্ত

গিয়েছিলেন] তারা অস্ত্রের সাহায্যে দমন করে রেখেছে যেখানে বীরত্বের কিছু নেই। নিন্দিত এই সেনাবাহিনী পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে ভারতকে [তাদের ভাষায় হিন্দুস্থান] এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কেও তারা ভারতের হিন্দুদের সমার্থক মনে করে। সেই বাহিনীর প্রতি এখন কোনো বাঙালি নারী গবেষণার মোড়কে তাদের অন্যায়কে খাটো করে দেখার প্রচেষ্টা করেন, তখন এটিই অনুধাবন করি পাকিস্তানের আইএসআই খুবই শক্তিশালী প্রভাবশালী, কার্যক্ষম আইনি সন্ত্রাসী একটি প্রতিষ্ঠান।

ইয়াসমিন সাইকিয়া ধর্ষণের নানা তাত্ত্বিক ব্যাখা দিয়েছেন। শুধু কয়েকটি পর্যবেক্ষণ।

১. বীরাঙ্গনা নামটি বঙ্গবন্ধুর দেয়া নয়। [পৃ. ৫৫] বঙ্গবন্ধু আসার আগে নারীনেত্রীরা এই নামটি দিয়েছিলেন।
২. গর্ভপাত করার জন্য "Chilling mandate" দিয়েছে মুজিব সরকার। [পৃ. ৫৯] গর্ভপাত মহিলারা নিজেরাই করিয়েছিলেন। যারা সন্তান রাখতে চেয়েছিলেন বা বাধ্য হয়েছে তাদের গর্ভপাত করানো হয়নি। এবং গর্ভপাত ধর্ষিতারাই করাতে চেয়েছিলেন। ডাক্তারেরা এতে আইনগত বাধা নেই বলে ঘোষণা করেন। এটি "Chilling mandate" নয়। সন্তান হওয়ার পর সামাজিক কারণে অধিকাংশ মাতা সন্তান রাখতে চাননি। তাই তাদের দত্তক হিসেবে প্রেরণ করা হয় আইনগত ভিত্তি দিয়ে। জাতি, জারজ পাকিস্তানিদের রাখতে চায়নি, এ ধরনের মনোভাব কারো কারো থাকতে পারে কিন্তু পুরো জাতি এটি ভেবেছিল আমার অন্তত সেটি মনে পড়ে না। ইয়াসমিন তথ্যপঞ্জিতে জানিয়েছেন, মহিলা পুনর্বাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহাঙ্গীর হায়দার 'পাকিস্তানি জারজ' শব্দটি ব্যবহার করেন, পুনর্বাসন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন রেহমান সোবহান। ঐ সময় জাহাঙ্গীর হায়দার নামে কোনো স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন না। রেহমান সোবহানও পুনর্বাসন কমিশনের প্রধান ছিলেন না।[৪২]

তিনি আসলে নারীদের অবস্থান কী ছিল সেটিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে তিনি মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই আলোকেই তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। গৃহযুদ্ধ বাঙালি– বিহারিদের মধ্যে, ইন্ধনের যোগানদাতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক ও ভারত। এবং বিহারিদের তিনি এই

ন্যারেটিভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন। সারা দেশে বিহারিদের সংখ্যা যত ছিল সেটি বিবেচনায় নিলে, গৃহযুদ্ধেও তারা প্রতিপক্ষ হয় না।

বাংলাদেশের গণহত্যা ও ধর্ষণ সম্পর্কে বয়ানটি দীর্ঘ হলো এবং অনেকে এটিকে এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে পারেন। কিন্তু, আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি কীভাবে গবেষকরা সূক্ষ্ম রাজনীতি করেন। পাকিস্তানের অনেক গণমান্য নাগরিক বলেছেন আমাকে ও শাহরিয়ার কবিরকে যে, শর্মিলা বসু-কে পাকিস্তানি জেনারেলরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। যে কারণে তিনি গণহত্যা-ধর্ষণ সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছেন। ইয়াসমিন পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিশিয়ানরা যা পছন্দ করেন তাই লিখেছেন, কিছুটা বিভ্রান্তও তিনি। এসব বই/প্রবন্ধ যখন প্রচারিত হয় তখন গণহত্যা-ধর্ষণ থাকে না। গণহত্যা-নির্যাতন জাদুঘরেরও যৌক্তিকতা থাকে না। এসব বয়ান তখন গণহত্যাকারী ও ধর্ষণকারীদের পক্ষেই যায়। সে জন্য মানব কল্যাণে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ ধরনের বয়ানের প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

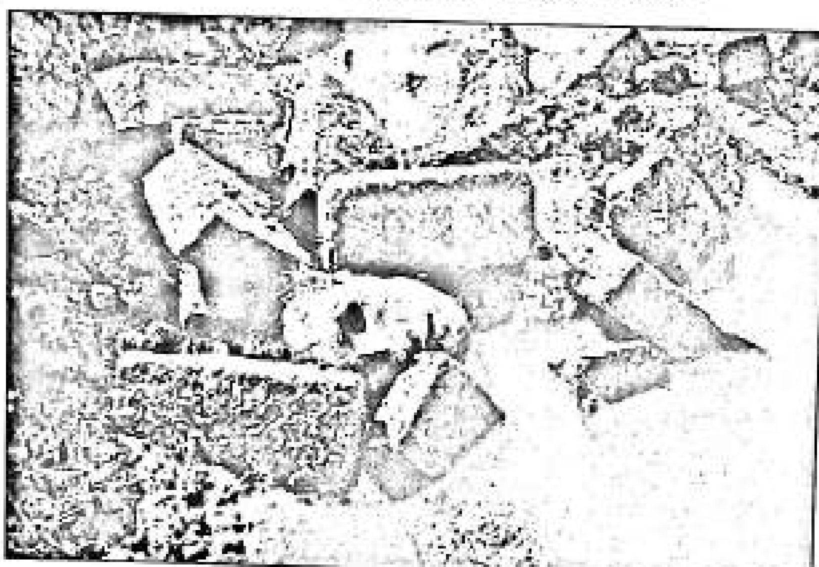

রায়ের বাজার বধ্যভূমি, ঢাকা। আলোকচিত্র : রশীদ তালুকদার

আগেও উল্লেখ করেছি আবারও যে সব বিতর্কের উল্লেখ করলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে–

সংখ্যার নির্দিষ্টকরণের পেছনে এক ধরনের রাজনীতি আছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে নাপাম দিয়ে যে গণহত্যা চালিয়েছে সেটিকে পাশ্চাত্যের কেউ

গণহত্যা বলেন না, বলেন যুদ্ধ। কারণ, যুদ্ধ বললে হত্যার দায় হ্রাস পায়। দুপক্ষে যুদ্ধ হলে তো মারা যাবেই। কিন্তু ভিয়েতনামে কি খালি যুদ্ধ হয়েছিল? ভিয়েতমান স্বাধীন হতে চেয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তা মানতে রাজি ছিল না। সে জন্য শুধু যুদ্ধ নয়, নিরীহ সিভিলিয়ানদের হত্যা করা হয়েছিল প্রায় ৪০ বছর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাশ্চাত্য ও আমেরিকান অনেক গবেষক/লেখক সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, গণহত্যার দায় তখন আর বর্তায় না। আগে উল্লেখ করেছি, সুহার্তোর হত্যা নিয়ে কখনও কথা বলা যায় না। ঐ গণহত্যা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, কেউ এ বিষয়ে কথা বলেন না। কারণ, কাজটি আমেরিকার সাহায্যে করা হয়েছে। এ কথা বলার পরও, বলতে হবে, পলপট যা করেছিলেন তা মানবতা বিরোধী অপরাধ। সুহার্তোও। ইয়াহিয়াও।

৭

গত শতকের আশির দশকে শাহরিয়ার ও আমি খুলনা গিয়েছিলাম। সেখানে শহরে ঢোকার মুখে দেখি যশোর রোডের নাম করা হয়েছে খান এ সবুর রোড। প্রেসক্লাবে, সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করলাম, একটি ঐতিহাসিক সড়কের নাম একজন রাজাকারের নামে হয় কী ভাবে? সবাই চুপ থাকলেন। অবাক হয়েছিলাম এ ভেবে যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিবিদরা আছেন কিন্তু কেউ টুঁ শব্দটি করেননি। নীরবতাও অপরাজনীতি। তারপর চুকনগর গণহত্যার কথা শুনি। গল্লামারির কথা তো জানতাম। পরে, রিট করে সবুর খানের নাম উঠিয়ে দেওয়া হয়। যশোর রোড ফিরে আসে। আশ্চর্যের বিষয় যে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো রাজনীতিবিদ এতে সাড়া দেননি। খুলনার সব রাজনীতিবিদ মনে করেন, সবুর খান খুলনা পাকিস্তানে এনেছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও যদি এ ধারণা পোষণ করা হয় তা হলে বুঝতে হবে আমাদের মানস জগত কতোটা পিছিয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হলেও মানসজগতে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের আধিপত্য রয়ে গেছে। ইতিহাসের সত্য হলো, মুসলিম লীগ আমলে সবুর খান ছিলেন খুলনার বড় ধরনের মাস্তান।

এখানেই আমরা গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সংকল্প করি। খুলনার ডা. শেখ বাহারুল আলম এগিয়ে এলেন। আমাদের সব সময়ের সহায়তাকারী শিল্পী হাশেম খান এলেন। খুলনায় এক ভাড়া বাড়িতে আমরা কাজ শুরু করলাম। হাশেম খান কিছু ছবি প্রিন্ট করে

দিলেন। দ্বারে দ্বারে তা বিক্রি করে খরচ মেটাতে লাগলাম। ২০১৪ সালের কথা। তখন খুলনার কমিশনার ছিলেন এম. এ. জলিল। তার কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির জন্য আবেদন করলাম। সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি তা বিবেচনা করবেন বলে জানালেন।

কিন্তু যে বাড়িটি আমরা চাইলাম তা আমাদের জন্য চিহ্নিত করা হলো না। সেটি প্রশাসন ক্যাডারের কনভেনশন হলের জন্য নির্ধারিণ করা হলো। একটি জীর্ণশীর্ণ বাড়ি পাওয়া গেল। এক বছর গেল। কমিশনার ফাইলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করলেন না। তার শেষ কার্যদিনেও তিনি স্বাক্ষর করলেন না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আমলা! তিনি ভাবছিলেন, যদি গণেশ উল্টে যায় তা হলে এর জন্য হয়ত তাকে দন্ড পেতে হবে। কারণ বিএনপি-জামায়াত সরকার তো আর যাই পছন্দ করুক 'গণহত্যা' ও 'মুনতাসীর মামুন' শব্দাবলি পছন্দ করবে না। বর্তমান সরকার তাকে হয়ত এ কারণে সচিব এবং অবসরের পর একটি সংস্থার চেয়ারম্যান করেছে। পরবর্তী কমিশনার হলেন এম এ সামাদ। তার ভাই শহিদ হয়েছিলেন। আমাদের সেই আবেদনপত্র তার কাছেও পড়ে রইল। পরে একদিন রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমদের সঙ্গে দেখা সচিবালয়ে। কেন এসেছি সেখানে জানতে চাইলেন। বিত্তান্ত বলার পরে বললাম, 'পূর্তমন্ত্রী মোশাররফ ভাইয়ের কাছে যাব।' বললেন, 'চলেন, আমি কারো কাছে যাইনি কিন্তু আপনার জন্য যাব।' মোশারফ ভাইকে জানালাম। তিনি পূর্ত সচিবকে বললেন ব্যবস্থা নিতে। তারপরও কিছু হয় না। আবারও তোফায়েল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বললেন, 'কী হলো?' বললাম, 'কমিশনার ফাইল পাঠাচ্ছেন না।' তখনই কমিশনারকে ফোন করে বললেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে যাতে ফাইল সচিবালয় আসে। এলো, এ কাহিনি চলমান। আর বলতে চাই না। জানালাম তা প্রধানমন্ত্রীর সচিব সাজ্জাদুল হাসানকে। তিনি বললেন, এখুনি দেখছেন। বলতে চাই, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইল পৌঁছার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ফাইলে সই করে দিলেন। না বিড়ম্বনার এখানে শেষ নয়। বাড়ি দেয়া হলো কিন্তু দলিল করেন না কমিশনার। পরে এইচ. টি. ইমাম বললেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে রেজিস্ট্রি করতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রেজিস্ট্রি হলো। সে বাড়ির আঙ্গিনায় কয়েক দশকের আর্বজনা জমে ছিল। ডা. বাহারের এক সপ্তাহ লেগেছিল এটি পরিস্কার করতে।

তারপর জানলাম, পাশের কয়েক কাঠাও একই জমির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারী থাকেন সেখানে। সে দু'কাঠা জমির জন্য আবারও আবেদন করলাম। মাস দুয়েক গেল, ফাইল নড়ে না।

কমিশনারকে ফোন করে জানলাম, যেহেতু ঐ কর্মচারি এটির জন্য দরখাস্ত করেছেন সেহেতু আমার দরখাস্ত বিবেচনায় আনা যাবে না। বললাম, 'আমার দরখাস্ত তো জনস্বার্থে, ব্যক্তিগত নয়।' তিনি রাজি নন। আমি কখনও যা করি না, তাই করলাম, একটু রূঢ়ভাবে বললাম, দরখাস্ত বিবেচনা করতে হবে। উনি জানালেন, সচিবকে দিয়ে তাকে বলাতে হবে। বলিয়েছিলাম এবং এ তদবিরের কারণে তিনি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইল গেলে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফাইল সই করলেন। জনাব সামাদকে পুরস্কার হিসেবে পরে নৌ পরিবহন সচিব করা হয়েছিল। নৌ মন্ত্রী শাহজাহান খান এক প্রকাশ্য সভায় বলেছেন, এই সচিবের কারণে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি চলচ্চিত্র করার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত গিয়েছিল। এ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের আমলাবৃন্দ। সরকার আবার বিশ্বাস করে এরা তাদের অনুগত।

সংক্ষিপ্ত আকারে বাংলাদেশে 'গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' কীভাবে স্থাপিত হয়েছিল তা বিবৃত করলাম। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই যে আমলারা, যাদের পূর্বসূরীরা হয়ত- আহত নিহত হয়েছিলেন তারা কি পূর্বসূরীদের ঋণ স্বীকারে রাজি নন? বা পাকিস্তানী মানসে কি আমরা এখনও আচ্ছন্ন? মনে রাখা দরকার শেখ হাসিনা তখন প্রধানমন্ত্রী। তারপরও প্রতি পদে পদে বাধা। কিন্তু অন্য কোনো প্রকল্পে বা টাকা স্যাংশনে বাধা নেই। এর কারণ কী? অর্থ?

আমি সব কাজ সমাপনের পর শিল্পী হাশেম খানের ছবির লিথো বিক্রি করে টাকা যোগাড় করছিলাম। ছবিতো কেউ কিনতে চান না। তারপরও সরাসরি না বলতে পারেন না। তখন একদিন কবি আসাদ মান্নানের সঙ্গে দেখা। তখন তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। তাঁর কাছে প্রিন্ট বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'আজীবন এভাবে আর কতো করবেন? আপনি একটি প্রকল্প দেন।' তিনিই তাঁর কর্মকর্তাদের দিয়ে প্রকল্পের খসড়া করালেন। বললেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পেশ করতে। সচিব ছিলেন রওশন আখতারী প্রগতিশীল হিসেবে খ্যাত। মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর তাকে ডেকে নির্দেশ দিলেন প্রকল্পটি ঠিক করে পাঠাতে। তিনি দীর্ঘদিন ফাইল আটকে রাখলেন। একদিন মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর তাকে, আমাকে, হাশেম খান, তারিক সুজাত ও আসাদ মান্নানকে ডেকে পাঠালেন। আমরা সবাই সচিবকে অনুরোধ জানালাম। তিনি স্মিত হাসলেন। কিন্তু তারপরও মাসখানেক ফাইল পাঠালেন না। পরে, আসাদুজ্জামান নূর কড়াভাবে বলাতে ফাইল পাঠালেন পরিকল্পনা কমিশনে। কমিশন ১৭টি আপত্তি দিলেন এবং

তা যৌক্তিক। আমরাতো আর সেসব জানি না। আমরা একদিন গেছি পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামালের কাছে ফাইলের কোনো খবর না পেয়ে। তিনি সচিবকে ডেকে ফাইল আনালেন। সব দেখে বললেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাইল পাঠিয়ে লিখেছেন প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের নয়। তা'হলে আমরা বিবেচনা করি কীভাবে? একজন জুনিয়র সচিবের এই ঔদ্ধত্যে আমরা বিস্মিত। মন্ত্রী আ.হ.ম মোস্তফা কামাল আসাদুজ্জামান নূরকে ফোন করে বললেন, 'নূর ভাই, আমার আরেকটা পরিচয় আছে লোটাস কামাল হিসেবে। আপনারও বাকের ভাই হিসেবে একটি পরিচিতি আছে। আপনার কর্মচারীদের সেই পরিচয়টি দিন।' তারপর সচিবকে বললেন, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রকল্পে ১৭টি ভুল থাকলেও শুদ্ধ করে পেশ করবেন।' তারপরও বিড়ম্বনার শেষ ছিল না। সবার ভাবটা এমন কাজ আমাদের নয়। তাই ফাইল হাতে আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হতো।

গণহত্যা জাদুঘর জায়গা পেল। পরিচিত হতে লাগল। ছোটখাটো আমলাদের কতো অপমান সইতে হয়েছে বলবার নয়। এরা ছিলেন ডেপুটি, জয়েন্ট সেক্রেটারি পদের। যদি আসাদুজ্জামান নূর, তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ইব্রাহিম খান, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আসাদ মান্নান ও মন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল সহায়তা না করতেন, এই দুই তিনজন আমলাই এ ধরনের একটি জাদুঘর বন্ধ করে দেয়ার জন্য ছিলেন যথেষ্ট।

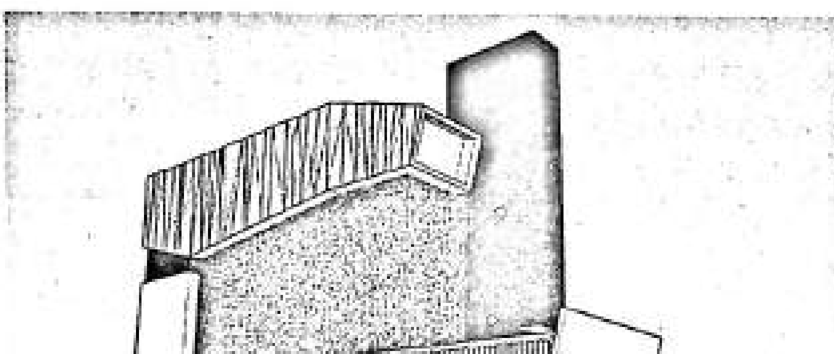

নির্মাণাধীন গণহত্যা জাদুঘরের আধুনিক ভবনের স্থাপত্য নকশা।
স্থপতি: মোঃ আনিসুর রহমান ভূঁইয়া।

শেখ হাসিনা আমাকে একবার বলেছিলেন, 'আপনারা জাদুঘর করবেন আমি সহায়তা করব। সরকারি নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের জাদুঘর হবে না।' এটিই হবে সরকারি নীতি এবং আমাদের কাছে তা যথার্থ মনে হয়েছে। তিনি দুটি জাদুঘরকেই অনুদান দিয়েছেন। আজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যে এত কাজ করতে পারছি তা উল্লিখিত ব্যক্তিদের জন্য এবং তারা সবাই রাজনীতি সচেতন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। আমলাদের অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের। ব্যতিক্রম কয়েকজন।

আমি এ ইতিহাসটুকু জানালাম এ কারণে যে, মুক্তিযুদ্ধের কারণে দেশ স্বাধীন হলেও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাদুঘর বা স্মারক করা দুঃসাধ্য। অথচ, সামরিক বাহিনীর কোনো স্থাপনা হোক, এই ডেপুটি-জয়েন্টরাই দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করে দেন।

এ বয়ান দেয়ার কারণ আছে। আমাদের এখানেই শুধু নয়, দেশের বাইরেও গণহত্যা স্মারক বা জাদুঘর স্থাপনে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা হত্যাকারী খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের বিচার হয়। অধিকাংশ ছাড় পেয়ে যায়, তাদের সহযোগীরাও। চারদিকে এসব দৃশ্য দেখলে মনে হয়, অত্যাচারীরা কেনো সব সময় সমাজে আনন্দ করে যায়? রোহিঙ্গাদের দেখুন। কী অত্যাচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের ওপর। অথচ অং সান সু চি সেজেগুজে, চুলে অর্কিড গুঁজে দেশ শাসন করেছেন। কেউ-ই তাঁকে শাস্তি প্রদানে ইচ্ছুক হননি। সুহার্তোর শাস্তি হয়নি। কম্বোডিয়ার সবার শাস্তি হয়নি। হলোকাস্ট যারা করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। অত্যাচারীরা এ পরম্পরা কীভাবে রক্ষা করে? আসলে মানবতা মুখের কথা। মূল কথা রাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করে যারা তারাই তাদের স্বার্থে ঠিক করে কী হবে। এক সময় ভেবেছিলাম, পুঁজিবাদী বা সামন্তবাদী রাষ্ট্রেই বোধহয় গণহত্যা হয়। পরে দেখি, সোভিয়েত রাশিয়ায় স্টালিন বীরদর্পে গণহত্যা চালালেন দীর্ঘ সময় ধরে। তাঁর বা তাঁর সহযোগীদের কোনো বিচার হয়নি। এবং সেটিও চালালেন মতাদর্শের নামে এবং যারা তখন এ মতাদর্শ সমর্থন করেননি তাদের আখ্যা দেয়া হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লব বিরোধী ও রাষ্ট্র বিরোধী হিসেবে।

৮

বাংলাদেশে জাদুঘর বা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপনের ইতিহাস বর্ণনা করলাম একটি কারণে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিত্তি মর্তাদশ। স্মৃতি সংরক্ষণ হচ্ছে ইতিহাস বর্ণনা করা। মুক্তিযুদ্ধ ও জয়লাভে এ দেশের মানুষের সংগ্রাম ও

আত্মত্যাগের কথা সবাই জানি। বৈরি পরিবেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভাড়া বাড়িতে দিন আনি দিন খাই এ ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হয়েছে। রাজনীতি করেন না এমন সব মানুষজনও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে সহায়তা করেছেন। বৈরি সরকার এতে বাধা দেয়নি। কারণ, তারাই রাজনৈতিক স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন করেছে। যারা এটি করেছিলেন তাদের রাজনীতি সবার জানা কিন্তু সমাজে তাদেরও প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ায় ব্যক্তির সামাজিক প্রভাব গণনীয়। এ ধরনের জাদুঘর গড়ার প্রচেষ্টা এখানে ছিল প্রথম। বৈরি সরকার মুখরক্ষার খাতিরে যৎসামান্য হলেও সহায়তা করেছে। উল্লেখ্য, কোন ধনী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়ায় তেমন সহায়তা করেনি। তারপরও দু'দশক লেগেছে জাদুঘর গড়ে তোলার মতো একটি ইমারত নির্মাণে। শেখ হাসিনা ও গণতান্ত্রিক সরকার না হলে আগারগাঁও-তে এতোবড় ইমারত গড়ে তোলা সম্ভব হতো না।

এর বিপরীতে গণহত্যা-নির্যাতন জাদুঘরের কাজ দ্রুত এগিয়েছে। নাগরিক চাঁদা যোগাড় দুঃসাধ্য ছিল কারণ, জাদুঘর হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-কে সবাই চেনে। দু'দশক সাধারণ চাঁদা দিতে দিতে ক্লান্তিও এসেছে। তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে এগোতে হয়েছে। এখানে আমলাতন্ত্র পদে পদে বাধা দিতে পেরেছে কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হলেও, রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রে শক্তিশালী। আমলাদের মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে। না হলে, দেশে মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শগত কাজ এগোতো না। অন্যদিকে, মতাদর্শকারণে মন্ত্রীরা এগিয়ে এসেছেন এবং অন্তিমে দেখা যাচ্ছে শেখ হাসিনা না থাকলে পাঁচ বছরে এ জাদুঘর এতোটা এগুতে পারত না। এ ধরনের রাষ্ট্রে সরকার প্রধানের মতাদর্শগত অবস্থান যদি প্রতিষ্ঠান গড়ার পক্ষে হয় তখন অন্তিমে কেউ আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে না।

ধারণা হতে পারে অধিকতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কী এটি সহজ? না, সবক্ষেত্রে তাও নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হতে পারে।

হলোকাস্টের পর ইউরোপে যে সব স্থানে গণহত্যা হয়েছিল সেখানে যে তখুনি তার সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা নয়। বা জাদুঘরও নির্মিত হয়নি। ইউরোপের মতো গণতান্ত্রিক সমাজে এ রকমটিতো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়েছিল। পরে নানা কারণে প্রতিবন্ধকতা এ সব স্মারক সংরক্ষণে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

হলোকাস্টের কবিতা ও অনেক পরিচয় পুরস্কার। শিল্পী: বেডরিক ফিটা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থাটা কেমন ছিল? পুরো ইউরোপ বিধ্বস্ত। মানসিকভাবেও ঐ সময়কার জেনারেশন অবসাদগ্রস্থ। কিন্তু, এরি মধ্যেই একদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েত প্রভাবিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠেছে। সবদেশে সমষ্টিগত অপরাধবোধেরও সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষভাবে জার্মানি বা ইতালিতে একারণে যে তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। অন্যদের অপরাধবোধ এ কারণে যে গণহত্যা তারা রোধ করতে পারেনি। কিন্তু, এ কথাও মনে রাখা দরকার, ইউরোপীয়দের মধ্যে স্মৃতি সংরক্ষণ ঐতিহ্য শক্তিশালী। গণহত্যার উপকরণ সমূহ খুব একটা নষ্ট হতে দেয়নি তারা বিশেষ করে আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে।

ইউরোপে নিহত ইহুদিদের স্মরণে নির্মিত স্মারক, বার্লিন, জার্মানি

তখনকার রাষ্ট্রনায়কদের সবাই লিবারেল ছিলেন তা নয়। কিন্তু, ঐতিহ্য অনুসারে তাদের মনে হয়েছিল স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতি সংরক্ষণ করা উচিত। তাতে নতুন প্রজন্ম ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ সম্পর্কে জানবে এবং দেশে সেগুলির উত্থান ঘটবে না। এ ইতিহাস বোধও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অংশ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন অগ্রসর হয়েছে, তেমনি সিভিল সমাজও অগ্রসর হয়েছে। গণহত্যার স্মৃতি এখনও ইউরোপে প্রবল তার প্রধান কারণ, বুদ্ধিজীবীদের দায় বোধ। সোভিয়েত অংশ এবং সোভিয়েত বিরোধী অংশ দুটি অংশেই লেখক শিল্পী চলচ্চিত্রকার যার যার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছেন। বলা যেতে পারে গত ৭০ বছরে হলোকাস্ট শিল্প সাহিত্য নামে স্বতন্ত্র একটি ধারার জন্ম হয়েছে যা গত সাতদশক প্রতিটি প্রজন্মকে গণহত্যা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে আসছে। অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইহুদি উদ্যোক্তরাইও অগ্রসর হয়েছেন। জাতিগতভাবে ইহুদীদের ভ্রাতৃত্ব বা 'কৌম' বোধ প্রবল। পশ্চিম ইউরোপের গণতান্ত্রিক কাঠামো তাতে সহায়তা করেছে। এছাড়া সংরক্ষণের ঐতিহ্য এতো প্রবল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুপক্ষই বিরত থাকার চেষ্টা করেছে ঐতিহাসিক স্থাপনায় বোমা ফেলা থেকে। আমেরিকা যখন আক্রমণ করে ইরাক তখন ব্যবিলনে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি। এসব কারণে, জার্মানি, পোলান্ড বা অন্যান্য অঞ্চলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু, তাতেও সময় লেগেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই। সম্প্রতি ইউরোপে এ ধরনের কিছু জাদুঘর দেখে এসেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকেই এ বয়ান।

৯

জার্মানীর ওপর সমষ্টিগত গণহত্যার দায়ভার চাপানো হয়েছে প্রায় ৭৫ বছর। এখনও তারা সে দায় থেকে মুক্তি পায়নি। জার্মানিতে একারণে, যে ধরনের বড়সড় হলোকাস্ট বা গণহত্যা জাদুঘর নির্মাণের দরকার ছিল তা কিন্তু হয়নি। মন থেকে জার্মানরা হয়ত চায়নি এ ধরনের জাদুঘর হোক। হলে, আজীবন সমষ্টিগত দায় বহন করতে হবে। এটা তো মিথ্যা নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জার্মানরা হিটলারের ব্যাপারে উল্লসিত ছিল। হ্যা, বড় বড় কানসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে, একটি জাদুঘর মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে অন্যকিছু তা করতে পারে না। পিয়ংইয়ং-এ এধরনের জাদুঘর দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ঐ জাদুঘর দেখলে একজনের মার্কিন ও জাপান বিরোধী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অন্যদিকে, ইহুদিরা যেখানে পেরেছে সেখানেই এ ধরনের জাদুঘর করেছে।

নিজেদের টাকায় যেখানেই ইহুদি নির্যাতন, গণহত্যার চিহ্ন পেয়েছে সেখানেই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু, এবার বার্লিনে যে কটি জাদুঘর দেখলাম, [যদিও এদের বয়স প্রায় দু' দশক] তাতে মনে হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা তারা পরিবর্তন করছে।

নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা করার ফল তিনটি স্মৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র। জাদুঘর আখ্যায়িত করা হয়নি। এর একটি হচ্ছে- 'মেমোরিয়াল টু দি মার্ডারড জুস' বা জার্মান ভাষায় 'ডেংকমাল ফুর ডাই এর মোরডেটেন জুডেন ইউরোপাস'। হলোকাস্ট মেমোরিয়াল বা হলোকাস্ট মাহনমাল নামেও পরিচিত। অন্য দু'টি হচ্ছে- 'মেমোরিয়াল অ্যান্ড ইনফরমেশন পয়েন্ট ফর দি ভিকটিমস অফ ন্যাশনাল সোশালিস্ট ইউথেনসিয়া কিলিংস' বা জার্মান ভাষায় 'গেডেনক-উন্ড ইনফরমেশনসট' ফুরডাই অপফার ডার ন্যাশনাল সোজিয়ালিস্টশেন 'ইউথেনসি মর্ডে' ও 'দি মেমোরিয়াল টু-হোমেসেকসুয়াল পারসিকিউটেড আন্ডার দি ন্যাশনাল সোশালিস্ট রেজিম।' এ ছাড়া আছে 'উবার আনা' বা 'অল অ্যাবাউট অ্যান।'

এখন যেখানে হলোকাস্ট মাহনমাল অবস্থিত হিটলারের গণহত্যা শুরুর আগে এটি ছিল ইহুদি এলাকা। হিটলারের সময়, এর কাছেই ছিল চ্যান্সেলেরি ও বাংকার। যুদ্ধের পর বার্লিন ওয়াল বা বার্লিন দেয়াল এই এলাকার মাঝ দিয়েই গড়ে উঠেছিল। এখন, অনেকগুলি বিদেশি দূতাবাস আছে আশেপাশে। এলাকাটি একদিক দিয়ে মহার্ঘ অন্যদিকে ঐতিহাসিকতো বটে।

এই স্মারক কেন্দ্র নির্মাণের ইতিহাসটা জানা দরকার। গত শতকের আশির দিকে টেলিভিশন সাংবাদিক লি রশ এবং ইতিহাসবিদ এবারহার্ড জ্যাকেল দাবি তোলেন, গণহত্যায় নিহত ৬০ লাখ ইহুদির জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ করা উচিত। রশ-ই এই প্রস্তাবের পিছে লেগে থাকেন। ১৯৮৯ সালে তিনি ছোটখাটো একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন এবং প্রচার চালাতে থাকেন। এই দাবির প্রতি জনমত গড়ে উঠলে বুন্ডেসটাগে বা সংসদ একটি প্রস্তাব পাশ করে এই দাবির পক্ষে।

১৯৯৪ সালে নকশার জন্য প্রতিযোগিতা আহবান করা হয়। বারোজন নকশাকার-কে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রতিযোগিতার জন্য। তাদের প্রত্যেক-কে দেয়া হয় ৫০,০০০ মার্ক। প্রায় ২৫,০০০ ইউরো। জুরি বোর্ড গঠন করা হলো শিল্পকলা, স্থাপত্য, নগর নকশা, ইতিহাস, রাজনীতি ও প্রশাসন থেকে।

৫২৮টি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল বার্লিনের নকশার জন্য। জুরিরা প্রাথমিকভাবে ১৩টি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আবারও জুরির বৈঠকে-১১টি প্রস্তাব নাকচ হলো। সবশেষে দু'টি প্রস্তাব থাকল। জুরিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের যে অর্থ বরাদ্দ আছে সে বরাদ্দে তারা কাজ সম্পন্ন করতে পারবে কিনা? হামবুর্গের সায়মন উঙ্গার ও ক্রিস্টিন জ্যাকব মার্কসের নকশা গৃহীত হয়েছিল। পরে ক্রিষ্টিনের নকশার অনুমোদন দেয়া হয়। জার্মানীর সরকার প্রধান ছিলেন তখন হেলমুট কোহল। তিনি এ প্রকল্পটির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু ক্রিষ্টিনের নকশা তার প্রছন্দ হয়নি। ফলে, ১৯৯৬ সালে আবার সীমিত আকারে প্রতিযোগিতা হলো। ২৫ জন-কে আহবান করা হয়েছিল প্রতিযোগিতার জন্য।

১৯৯৭ সালে স্থপতি পিটার আইজোমান ও আর্টিস্ট রিচার্ড সেরোর নকশা জুরি বোর্ড পছন্দ করল। তাদের নকশার মূল বিষয় ছিল ১,৮০,০০ বর্গফুটে ৪,০০০ পাথরের পিলার থাকবে। নকশা অনুমোদনের পর সেরা নিজেকে সরিয়ে নেন। অন্যদিকে, কোহলও রদবদলের কিছু প্রস্তাব করেন। আইজোনম্যান রাজি হলেন। যেমন পিলারের সংখ্যা নেমে হলো অর্ধেকে। এরি মধ্যে গেরহার্ড স্রোডার চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। এই নকশা প্রথমে তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন, পরে তা অনুমোদন করেন। নকশার কিছু বদল ঘটে। ২৮,০০০ পিলারের বদলে ১,৮০০ থেকে ২,১০০ পিলার অনুমোদিত হয়। বলা হলো এর সঙ্গে থাকবে একটি স্মৃতির নীড় বা হাউস অব রিমেমবারেন্স। এটি আর্কাইভ, তথ্যকেন্দ্র ও প্রদর্শনীর জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যাক, অনেক প্রক্রিয়ার পর সংসদে ৩১৪-২০৯ ভোটে প্রস্তাব পাশ হলো। মনে রাখা দরকার, তথ্য কেন্দ্রের বিরোধীদের সংখ্যাও কম ছিল না। অনেকেই একদম এই ধরণেরস স্মৃতিসংরক্ষণ কেন্দ্র চাচ্ছেন না। তথ্যকেন্দ্র-সাজানোর ভার পড়ল নকশাবিদ ডাগমারভন উইলকেনের ওপর। ২০০১ সালে পত্রিকা ও বিভিন্ন বিলবোর্ডে একটি বিজ্ঞাপন দেখা গেল। চমৎকার সুন্দর এক সবুজ পাহাড়, পাশে লেক আর তার ওপর বড় বড় হরফে লেখা-হলোকাস্ট কখনও হয়নি। নিচে অবশ্য ছোট হরফে লেখা ছিল-এখনও অনেক মানুষ এটি মনে করেন। ২০ বছর পর এ সংখ্যা আরো বাড়বে। সুতরাং স্মৃতি সংরক্ষণ করতে হবে। তারা ২০ লক্ষ মার্ক অনুদান পাওয়ার আশা করছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল জুইস মিউজিয়াম এটি পরিচালনা করবে।

২০০০ সালে একটি প্রতীকী অনুষ্ঠান হলো ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের আগে। আন্তর্জাতিক সেমিনারও হলো। ২০০৩ সালে কাজ শুরু হলো।

প্রস্তাবের ১৯ বছর পর। ২০০৫ সালে স্মৃতি কেন্দ্র খুলল। ঐ বছর ৩,৫০,০০০ দর্শক এসেছিলেন এটি দেখতে। তবে, এই নির্মাণের মধ্যেও নানা বাধা এসেছিল। যেমন ২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডের একটি কাগজে বেরুলো স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণে প্রটেক্টোসিল ব্যবহৃত হচ্ছে দেগুসা কোম্পানীর। প্রটেক্টোসিল থাকলে দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকা যাবে না। পত্রিকা জানালো দেগুসার সাবসিডিয়ারি ডেগেশ্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিদের জিকলন বি গ্যাস বিক্রি করেছে যা দিয়ে গ্যাস চেম্বারে অগণিত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের বিতর্ক চলেছে, কিন্তু অবশেষে জাদুঘরের [তথ্যকেন্দ্র] কাজ শেষ হয়েছে।

আরো দু'টো তথ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, পাশ দিয়ে গেছি ভেতরে যাইনি। ২০০৮ সালে নির্যাতিত সমকামীদের স্মারক-এর উদ্বোধন হয় টিয়েরগার্টেন-এ। টিয়েরগার্টেন স্ট্রাসেতেই ইউথেনসিয়া কিলিং স্মারক। বৃদ্ধ, পঙ্গু, অটুস্টিকদের হিটলার হত্যা করেছিলেন আর্যদের দেশের মানুষদের সৌন্দর্য বর্ধনে। এদের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় তিন লক্ষ।

স্থপতি উরসুলা উইলিয়ামস এবং নির্মাণ স্থপতি নিকোলাউস কলিউসিস ও হেইনজ হলম্যান 'ইউথেনসিয়া মেমোরিয়াল'-এর নকশা করেছেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কনক্রিটের ওপর ২৪ মিটার নীল কাঁচের দেয়াল। কনক্রিটের বেঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দর্শকরা ১০ জন ভিকটিমের প্রতিকৃতি বা হত্যার ইতিহাসের চিত্র দেখতে পাবেন। ২০১১ সালে জার্মান সংসদ এটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৪ সালে এর দ্বারোদঘাটন করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য, ২৪ ঘন্টাই এই কেন্দ্রটি উন্মুক্ত। জীপসীদেরও হত্যা করেছিল নাজীরা। তারও একটি তথ্যকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

আগে উল্লেখ করেছি এই স্মৃতিকেন্দ্র করার বিষয়টি জার্মান সংসদ বা বুন্ডেস্টাগে পাশ করা হয়েছিল। কেন্দ্রের বোর্ড অব ট্রাস্টির সভাপতি, বুন্ডেস্টাগের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নরবার্ট ল্যাম্বার্ট জোরালো ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন রাজনীতি বাদ দিয়ে। তাঁর মূল কথা হলো, জার্মান ইতিহাসের যে সব ঘটনাবলি হওয়ার কথা না কিন্তু হয়েছে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার। সব সময় গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কে রক্ষা করা। আইনের চোখে সবাই কে সমান ভাবে দেখা এবং সব ধরনের একনায়কত্ব বা সন্ত্রাসের ওপর ভিত্তি করা শাসন কে প্রতিরোধ করা।

[''It is a expression of the German parliament's commitment to honour the murdered victims. Keep alive the memory of these

inconceivable events in German history and to admonish all future generations never again to violate human rights, to defend the democratic constitutional state at all times, to secure equality before the law for all people and risist all forms of dictatorship and regimen based on violence."]

ফেডারেল কমিশনার ফর কালচার অ্যান্ড মিডিয়া প্রফেসর মনিকা গ্রুটার্সও একই ধরনের দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন যেখানে সমষ্টিগত দায়িত্বের কথা এসেছে। গণহত্যা ও সমষ্টিগত দায়িত্ব এখনও আলোচনার বিষয়। জার্মানীতে যখন গণহত্যা চলছে তখন হিটলারের সরকার এককভাবে করেছে তাতো নয়, পুরো জার্মানী তা সমর্থন করেছে। মুষ্টিমেয় সমর্থন করেনি। সুতরাং, গণহত্যার দায়িত্ব জার্মানীর, জার্মানবাসীর। জার্মানী পরাজিত হয়েছে তাই গণহত্যার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তিয়েছে তা' নয়। জার্মানীকে আজীবন এ কলঙ্ক বহন করতে হবে সত্যি কিন্তু জার্মানী আবার এখন গ্রহণযোগ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তারা তাদের দায় স্বীকার করেছে, ভিকটিমদের স্মৃতি রক্ষা করছে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য।

এখন হয়ত মন থেকে তারা এ দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কিন্তু সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণে তা সম্ভব নয়। একইভাবে জাপানকে চীনে গণহত্যার দায় স্বীকার করতে হবে, রুয়ান্ডার হুতিদের এবং বসনিয়ায় সার্বিয়ানদের। পাকিস্তান এখনও বাংলাদেশে গণহত্যা দায় স্বীকার করেনি সে কারণে বাংলাদেশ-কে সব ফোরামে এই গণহত্যার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণ করতে হবে এবং যতদিন পাকিস্তান সমষ্টিগত ভাবে দায় স্বীকার না করবে ততদিন নৈতিকভাবে সে সভ্য সমাজের সভ্য হতে পারবে না। গণহত্যা এমন অপরাধ যার দায় সমষ্টিগত এবং চিরদিনের। এটির দায়ভারও আছে, না হলে, পৃথিবীতে মানবাধিকার বলে কিছু থাকবে না। এ বিষয়ে যে আদালত হয়েছে তার বিচারিক সময় অবশ্যই কমানো দরকার না হলে 'জাস্টিস' বা 'বিচার' ন্যায্য হয় না। একটি উদাহরণ দিই, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার যদি দশ বছর লাগে তো রোহিঙ্গারাও থাকবে না, যারা অপরাধী তারাও থাকবে না। তাতে লাভ কী? তবে গণহত্যার বিষয়টির নৈতিকতাটা কেমন তার উদাহরণ দিই। সুচি মিয়ানমার ছাড়া আর কোথাও যেতে পারেন না। পারবেনও না। তাঁর প্রায় সমস্ত সম্মান কেড়ে নেয়া হয়েছে। এ রকম ভাবে বেঁচে থেকে সামান্য ক্ষমতা লাভ এর অর্থ একমাত্র সুচি-ই হয়ত জানেন। এখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বিষয়টি আরো ভালো ভাবে বুঝছেন।

পোল্যান্ডে একজন ইহুদির ওপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে নাজি সদস্যরা, ১৯৩৯, তথ্যকেন্দ্রে প্রদর্শিত আলোকচিত্র

প্রফেসর গ্রুটার্স বলেছেন- "As a human rights violation on an unprecedented scale, the systematic genocide of European jew's will forever retain an unparalled significance in German commemorative culture. It is our responsibility to remember these crimes and to commemorate the victims in a dignified way." এই স্মৃতি কেন্দ্র সমস্টিগত জার্মান দায়ের দৃশ্যমান উদাহরণ।

লি রশ মূল কথাটি বলেছেন। এবারহার্ড জ্যাকেল এবং তিনি প্রথম এই প্রস্তাবটি করেছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল তিনচার বছরের মধ্যে এটি করা যাবে কিন্তু যায়নি, লাগল ১৯ বছর।

তিনি বলেছেন, আমরা পশ্চিম বার্লিনের বাসিন্দা, না আছে অর্থ না আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা। আমাদের ছিল একটি আইডিয়া এবং এই ধারণা মানুষকে গ্রহণ করতে প্রণোদনা দেওয়া। বিষয়টা সাধারণ, ইউরোপীয় ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছে। আমরা এটা স্মরণে রাখতে চাচ্ছিলাম আর সম্মান জানাতে চাচ্ছিলাম মৃতদের। "to give them back their names."

আমরা চাচ্ছিলাম না জার্মানী আবার ঐক্য, পুনর্গঠন ও সম্পদ নিয়ে মেতে উঠুক আর ভান করুক যেন কিছুই হয় নি। "We wanted to prevent Germany from simply getting down to the business of reunification. rebuilding, affluence- as if nothing happened. But that would not be easy. Because at no other time in history had a nation, a people, admitted to and visibly documented such a tremendous crime committed in its name."

প্রথমে তারা সমর্থক হিসেবে পেয়েছিলেন উইলি ব্রান্ডট-কে যিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইউরোপীয় ইহুদিদের যে হত্যা করা হয়েছে তা স্মরণে রাখতে হবে। রশ লিখেছেন, এ বিষয়ে প্রচার চালাবার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছি, ঝড়োবাতাসে, বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি, বিস্কুটের টিনে সহায়তা নিয়েছি এবং একসময় দেখলাম ১০,০০০ স্বাক্ষর আর ১,০০,০০০ ডয়েস মার্ক জমা হয়েছে। অনেকে প্রতিমাসে ১০ ইউরো জমা দিয়েছেন। অবশেষে সংসদে ৩১৪-২০৯ ভোটেই প্রস্তাব পাশ হয়েছে।[৩০]

আগে বাংলাদেশে গণহত্যা জাদুঘরের কাহিনি উল্লেখ করেছি এ কারণে। জার্মানীর মতো দেশে ১৯ বছর লেগেছে এই স্মারক কেন্দ্র নির্মাণে ভাবতেই অবাক লাগে। সংসদেও ২০৯ ভোট পড়েছে বিপরীতে। এর অর্থ, নতুন জার্মানী আর এসব স্মৃতি সংরক্ষণে আগ্রহী নয় যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল গণহত্যাকারী। কিন্তু, যে ভাবেই হোক, ইউরোপে গণতন্ত্রের এই সংস্কৃতিটি ভিত্তি পেয়েছে যে অপরাধ চিহ্নিত করতে হবে, অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবে এবং নাজি বা ফ্যাসিবাদ তারা চায় না। যে কারণে, ইউরোপে নাজি ও ফ্যাসিবাদ অঙ্কুরিত হলেই তা উপরে ফেলা হয়। এবং এটাও স্বীকার্য যে ইউরোপে নাজি ও ফ্যাসিমনা ইউরোপীয়দের অভাব নেই। এটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

ইউক্রেনের একটি গ্রামে নাজিরা হত্যা করেছিল এক হাজারের ওপরে ইহুদিকে, তথ্যকেন্দ্রে প্রদর্শিত ছবি।

বাংকার জাদুঘরের কথা বলতে হয়। একদিন হাতে, দেখি সময় প্রচুর, জুইস জাদুঘর দেখার পর, উবার পৌঁছে দিল বাংকারে। ঠিক সময়ে পৌঁছলাম, কারণ, তারপর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। ফটক পেরিয়ে এমন কিছু মনে হলো না। লোহার চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। তারপর পুরনো আমলের কাঠের ফটক। নিজেই সেটা খুলে ভেতরে ঢুকলে কাউন্টার, তারপর জাদুঘরের শুরু।

১৮৮০ সালে আনহালটার বানহফ বা রেলস্টেশন তৈরি হয় বার্লিনে। ঐ সময় ইউরোপে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো এবং এক সময় বার্লিনে বৃটিশরা বোমা ফেলতে লাগল, তখন হিটলার সরকার ঠিক করল রেলস্টেশনে যাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য বাংকার তৈরি করতে হবে। আনহালটার বানহাফে ১৯৪২ সালে বাংকার বা মাটির নিচে আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি হলো। স্টেশনের ভেতর নির্মিত হলো একটা টানেল।

সেই টানেলের ভেতর দিয়ে যাত্রীরা বাংকারে যেত। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন সোভিয়েত ফৌজ অবিরাম বোমা বর্ষণ শুরু করে বার্লিনে তখন অনেকে স্থায়ীভাবে চলে আসেন বাংকারে। এক পর্যায়ে ১২,০০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বাংকারে।

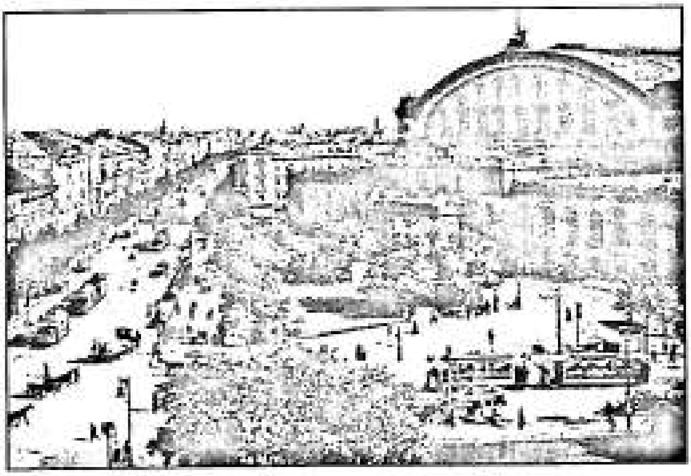

আনহালটার বানহফ বা রেলস্টেশন

১৯৪৫ সালের ২ মে, কী কারণে জানা যায়নি এস এসের সদস্যরা বাংকারে আশ্রয় প্রার্থীদের চলে যেতে বলে। বাংকার থেকে ১৫০ মিটার দূরে ছিল টানেল যেটি নির্মিত হয়েছিল ল্যান্ড ওয়ের ক্যানাল বা খালের নিচে,

এই টানেলটি উড়িয়ে দেয় এস এস। ফলে, বার্লিনের নিচে যে টানেল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ডুবে যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে, বাংকারের পানি সেচে সেটিকে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের গুদাম হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। পশ্চিম বার্লিনে বসবাসরত ২০ লক্ষ মানুষের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বার্লিনের দেয়াল উপরে ফেলার পর জরুরি খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ফুরায়। আধ বিলিয়ন ডয়েস মার্ক মূল্যের খাদ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হয় সাহায্য হিসেবে।

১৯৯০ এর শেষের দিকে বাংকারে ছোট একটা জাদুঘর খোলা হয়। ২০১৪ সালের দিক থেকে বাংকার নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা হয়।

বাংকারের ইতিহাস নিয়েতো জাদুঘরের একটা কাঠামো ছিলই। উনটার ডেন লিন্ডেনে বার্লিন স্টোরি মিউজিয়াম ছিল, সেটি স্থানান্তর করা হয় এখানে ২০১৫ সালে। ২০১৬ সালে গড়ে তোলা হয় 'ডকুমেন্টেশন ফুয়েরার বাংকার'। ২০১৭ সালে 'হিটলার-হাউ কুড ইট হ্যাপেন'-বাংকারের তিনটি ফ্লোর নিয়ে গড়ে ওঠে। এ সব মিলিয়ে বাংকার। বাংকারটি পাঁচতলা, পুরো কনক্রিটের। ১০ মাস লেগেছিল এটি তৈরিতে।

জাদুঘরটি সেই ন্যাশনাল সোসালিস্ট আমলের ওপর গুরুত্ব দিয়ে করা। অর্থাৎ ঐ আমল বা ঐ চিন্তাধারার বলি হয়েছে মানুষ কীভাবে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে মূলত: আলোকচিত্রের সাহায্যে। বার্লিনে যতগুলি জাদুঘর দেখেছি বাংকারে স্পেস সবচেয়ে বেশি। অসংখ্য আলোকচিত্র বিশেষ করে 'হিটলার হাউ কুড ইট হ্যাপেন' বিভাগে, দেখতে দেখতে ক্লান্তি লাগে। একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে, আচ্ছা, জিনিসপত্রে ঠাসা জাদুঘর কি ভালো লাগে? নাকি পরিমাণমত বস্তু সামগ্রী দিয়ে মূল বিষয় তুলে ধরলে তা দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে? বাংকারে একটি স্পেস [ঘর] হিটলারের বাংকারে অবিকল করা হয়েছে। সেখানে ভিডিও ফিল্মও দেখানো হচ্ছে। হিটলারকে নিয়ে একটি সিনেমা যেখানে দেখানো হয়েছে বাংকারে তিনি বিয়ে করছেন ইভা ব্রাউন-কে।[৪৪]

বার্লিনে 'গণহত্যা' বিষয়ক যতগুলি জাদুঘর/স্মারক/তথ্যকেন্দ্র দেখলাম, সবগুলিতে হিটলার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নাম অনুচ্চারিত বরং বারবার ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট পার্টির কথা বলা হয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে, পৃথিবীতে হিটলার নামটি সবচেয়ে বেশি পরিচিত। প্রতিটি জাদুঘর গড়ার পেছনে ইহুদি অ্যাকটিভিস্টদের লবি কাজ করেছে, কিন্তু, বর্তমান জার্মান মনোভাবের সঙ্গেও তাদের সমঝোতা করতে হচ্ছে। ওয়াশিংটন ডিসির

মতো হলোকাস্ট মিউজিয়াম করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, ইহুদিরা জাদুঘরের মাধ্যমে তাদের রাজনীতিটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং পাশ্চাত্যও তাতে সায় দিয়েছে। কিন্তু, এর মাধ্যমে একপেশে ইতিহাসই এতদিন বিবৃত হয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো হয়নি।

১০

রুশদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হলদোমোর জাদুঘর। সম্পূর্ণ সরকারি সাহায্যে এটি নির্মিত হচ্ছে। এই জাদুঘর গড়ার পেছনের ইউক্রেনের ভাষ্য হচ্ছে এ রকম–

সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়ার পর কালেটিভাইজেশন চালু হয়। কুলাকদের [ধনী কৃষক] জমিচ্যুত করা হয় ক্ষতিপূরণ ছাড়া। গুলাগে পরিবারের পর পরিবার পাঠানো হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত খামারের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৫২,০০০ তে, ১,৫০০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ইউক্রেনীয় গ্রামগুলি কালেকটিভাইজেশন প্রোগ্রাম পছন্দ করেনি। ১৯৩০ সালে লোক দেখানো বিচারে ৩০ হাজার মানুষকে দমন করা হয়। ১৯৩২ সালের মধ্যে ১০০০ হাজারের বেশি গীর্জা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং গীর্জার সম্পদ রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে।

সোভিয়েত নীতি অনুযায়ী, খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হয় গত শতকের ত্রিশ দশকে। ১৯৩২-৩৩ সালে তা চরমে ওঠে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্য না পেয়ে ৭০ থেকে ৯০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এটিকেই বলা হয় হলদোমোর।

সোভিয়েত সরকারের কারণে সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষে যে মানুষ প্রাণ হারায় সেটিকেই গণহত্যা বলা হয়। ইউক্রেনের আদালত এটিকে গণহত্যা বলে ঘোষণা করেছে এবং এর জন্য দায়ী করেছে- জে.ভি. স্টালিন, ভি এম মলোটোভ, এল.এম কাগনোভিচ, পিপি পোস্টিশেভ, এস.ভি কোসিওর, ডি.আই চুবার এবং এমএম খাতায়িভিচকে। জাতিসংঘের কনভেনশন অন দা প্রিভেনশন এন্ড পানিশমেন্ট অফ দি ক্রাইম অব জেনোসাইড-এর এক গৃহীত চার্টারের দ্বিতীয় ধারায় আছে।–

"Genocide means acts committed with the intent to destroy in whole or in part any national, ethnic racial or religious group as such."

ইউক্রেনিয়ানরা মনে করে, সোভিয়েত সরকার সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ৭০ থেকে ৯০ লক্ষ হত্যা করা হয়েছে। এবং এ কারণে জাতিসংঘের ঐ

ধারা অনুযায়ী তা গণহত্যা। ইউক্রেনিয়ানরা বলছে 'আমাদের হত্যা করা হয়েছে যেহেতু আমরা ইউক্রেনীয়।'[৪৫]

এ পরিপ্রেক্ষিতে জাদুঘর ঐ সময়ে বেঁচে যাওয়া মানুষজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। তবে, অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, যারা বেঁচেছিলেন তাদের মারা গেছেন অনেকে।

'১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' থেকে *গণহত্যা নির্ঘন্ট* প্রকাশ করতে গিয়ে আমরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এখানে এখন দুর্ভিক্ষের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে তার সংখ্যাও কম।

হলদোমোর গণহত্যা জাদুঘর এখন নির্মিত হচ্ছে বিশাল জায়গা নিয়ে। মূল ফটকে হেঁটে পৌঁছাতেই লাগবে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট। একটি ঘরই সাজানো হয়েছে। এ ঘরটি ইউক্রেনীয়দের জীবনচর্যা তুলে ধরা হয়েছে ছবি ও বস্তু সামগ্রী দিয়ে। এখন পাশ্চাত্যের সব জাদুঘরই ইন্টারএ্যাকটিভ। এখানে নতুন যা দেখানোর তা হলো কয়েকটি ষ্ট্যান্ডের ওপর রাখা কালো চামড়ায় বাধানো রেজিষ্ট্রার। এসব রেজিষ্ট্রারে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলির নাম দেয়া হয়েছে 'ব্ল্যাক বুক'। জাদুঘরের কর্মকর্তা ইরিয়ানা জানান, অনেকে আসেন এই ব্ল্যাকবুকে তাদের আত্মীয় স্বজনের নাম খুঁজতে।

জীবনচর্যার বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে রাখা হয়েছে কিছু আলোকচিত্র। বোঝা যাচ্ছে তাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের আলোকচিত্র দিয়ে আরেকটি ঘর সাজানো হবে। রাতেও নির্মাণের কাজ চলছে। পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী জাদুঘরটি নির্মিত হচ্ছে। সরকার বিনিয়োগ করছে ভালোভাবে। একটি ঘর-কিন্তু তা ঘুরে ঘুরে দেখলে, সে সময়ের ইউক্রেনের গ্রামগুলোর অবস্থা, দুর্ভিক্ষ এবং প্রাণহানি সব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ইরিয়ানা তাও ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বললেন, পাশে একটি মেট্রোরেলের স্টেশন হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হলদোমোর জাদুঘর কিয়েভ কেনো ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় জাদুঘরে পরিণত হবে। এটি হবে ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং রুশদের বিরুদ্ধে প্রপোগান্ডার বড় হাতিয়ার। হলদোমোর থেকে ফেরার পথে মনে হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এখানেও তো জার্মান ও তাদের সাথীরা প্রচুর মানুষ হত্যা করেছে, গণকবর দিয়েছে, ইহুদিদের পালাতে হয়েছে, তাদের ব্যাপারে এখানে সবাই নিশ্চুপ। হলদোমোর সঙ্গে সেই নিধনযজ্ঞ নিয়ে প্রদর্শনী হলে হলদোমোর নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। উগ্র জাতীয়তাবাদের সমস্যা এখানেই। এই জাদুঘর দেখতে ভবিষ্যতে প্রচুর মানুষ আসবেন। কিন্তু, ফিরে যাবেন ঐ প্রশ্ন নিয়ে, অন্য গণহত্যা কেনো এখানে অন্তর্ভুক্ত হলো না?

১১

জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বেলসেন মুক্ত হয় ১৯৪৫ সালে। ঐ বছর বৃটিশরা এখানে একটি ফলক লাগিয়েছিল। যে সব ইহুদিদের ক্যাম্পে আনা হয়েছিল এবং বেঁচেছিলেন তারাও ঐবছর কাঠের একটি স্মৃতি ফলক লাগিয়েছিলেন।

বের্গেন-বেলসেন মুক্ত হবার পর, ১৯৪৫

পরে তা পাথরে করা হয় ১৯৪৬ সালে। একই বছর সোভিয়েতরা যুদ্ধবন্দিদের কবরে এবং পোলিশরা ক্যাম্প এলাকায় ফলক লাগায়। এখানে অনেক জায়গায় ছিল গণকবর। একজায়গায় পাথরের ছোট একটি ফলক– 'এখানে সমাহিত ৫০০০ মানুষ।' এপ্রিল ১৯৪৫। অ্যানা ফ্রাঙ্ক ও তার বোন মারগটের নামে আছে ফলক। ১৯৫২ সালে এখানে যখন একটি স্মৃতিস্তম্ভ করা হয় তখন জার্মান প্রেসিডেন্ট থিয়োডর হিউস বলেছেন, বেলসেনে কী ঘটেছিল জার্মানরা যেন তা না ভোলে।

আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক বেলসেন বের্গেনের সংরক্ষণের বিষয়টি। ১৯৫০ পর্যন্ত মাঝে মাঝে সেখানে দু'একটি স্মৃতিফলক লাগানো হয়েছে। ঐ সময় অসউইৎজ ও অন্যান্য ক্যাম্পের উত্থানের ফলে বেলসেন বের্গেনের নামটি প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। ১৯৫৭ সালে তরুণদের বেশ বড় সড় গ্রুপ অ্যানা ফ্রাঙ্কের মৃত্যুস্থল দেখতে আসেন। তখন বেলসেন- বের্গেনের নাম আবার পত্রিকায় উঠে আসে। ১৯৫৯ সালে কলোনে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে ইহুদিদের ধর্ম

মন্দিরে ইহুদি বিরোধী গ্রাফাতি আঁকা হয়। ইহুদি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন নাহুম গোল্ডম্যান। জার্মানীর চ্যান্সেলর তখন কনরাড অ্যাডেনিউর। গোল্ডম্যান সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। অ্যাডেনিউর তখন বেলসেন সফরে আসেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ করার ঘোষণা দেন।

গত শতকের ষাটের দশক থেকে প্রধানত ইহুদি নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে বেলসেন। তারপর সেখানে আস্তে আস্তে একটি তথ্যকেন্দ্র ও প্রদর্শনীকেন্দ্র গড়ে ওঠে। মূল ফোকাস- অ্যানফ্রাঙ্ক, নেদারল্যান্ডেও কীভাবে এই ক্যাম্পটি গড়ে উঠল।

১৯৭৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত নানা ঘটনা ঘটে। জার্মান প্রেসিডেন্ট, চ্যান্সেলর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান, ইউরোপিয় সংসদের সভাপতি সাইমন ভেইল প্রমুখ বেরগেন- বেলসেন সফর করেন। এর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্য ও ফেডারেল সরকার নতুন ভাবে গড়ে তোলে বেলসেন-বের্গেন। তখন শুধু ইহুদি নয়, অন্যান্য ভিকটিমদের গাঁথাও স্থান পায়।[৪৬]

জার্মানীর মাউথহাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প মুক্ত হয় ১৯৪৫ সালে। মাউথাউসেন-কে ১৯৪৯ সালেই জাতীয় স্মৃতি সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অস্ট্রিয়ার চান্সেলর ব্রুনো ক্রিয়েসকি ১৯৭৫ সালে মাউথেসন জাদুঘর উদ্বোধন করেন। অর্থাৎ 'ন্যাশনাল মেমোরিয়েল সাইট' হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ৩০ বছর পর মাউথহাউসেন এ রূপ পেয়েছে। এর সাব-ক্যাম্পগুলির কোনো স্মৃতি এখন আর নেই। আবাসিক এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছে সেগুলি।

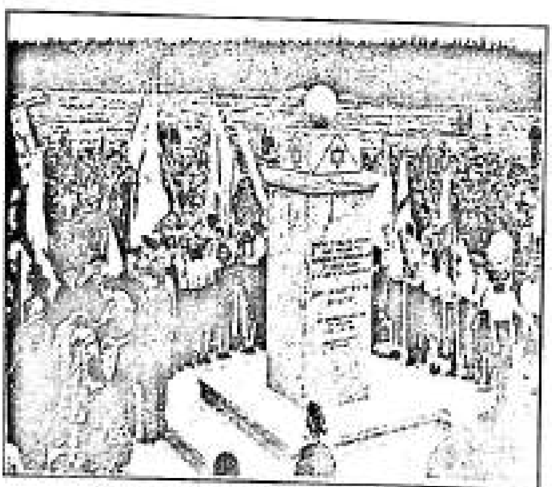

বের্গেন-বেলসেনের স্মৃতিস্তম্ভ, ১৯৬৫

১২

আমস্টার্ডামের অ্যান ফ্রাংক মিউজিয়াম গড়ে উঠতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। অ্যানেরা যে বাড়িতে থাকতেন ১৯৫৫ সালে, এ বাড়িটির নতুন মালিক (একটি কোম্পানি) ২৬৩ নম্বর বাড়িটিসহ আরো কিছু বাড়ি ভেঙে বড়োসড়ো একটি অফিস বিল্ডিং করার উদ্যোগ নেয়। আর তখনই পত্র-পত্রিকা ও সাধারণ মানুষ এটিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। গঠিত হয় অ্যান ফ্রাঙ্ক ফাউন্ডেশন। অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। বাড়ির মালিক ফাউন্ডেশকে বাড়িটি দান করেন। ১৯৬০ সালের ৩ মে উদ্বোধন করা হয় জাদুঘরের। মূল বাড়িটির পাশের বাড়িটিরও এখন জাদুঘরের অংশ।[৪৭]

সারায়েভোতে গণহত্যা জাদুঘর হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। এটি আমাদের মতো সম্পূর্ণ সিভিল সোসাইটির উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। বসনিয়ায় গণহত্যায় নিহত হয়েছেন এ রকম পরিবারের কয়েকজন মিলে উদ্যোগটি নিয়েছেন। সরকার এতে কোনো সাহায্য করছে না। এর ধরণটি আমাদের মতো। সারায়েভোয় চাইল্ডহুড মিউজিয়ামটিও ভিকটিমরা গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ নতুন কনসেপ্টে। সেখানেও সরকারি সাহায্য নেই।[৪৮]

আমেরিকার ওয়াশিংটন হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউয়াজিয়ামের কথা বলতে পারি।

ওয়াশিংটনের সবচেয়ে দামি জায়গায় জাদুঘরটি। ন্যাশনাল মলের পাশেই। আন্ডারগ্রাউন্ড ধরলে নামতে হবে স্মিথসোনিয়ানে। ১৯৭৮ সালে এ জায়গাটি নির্বাচন করা। জায়গাও কম নয়, ১.৯ একর। এ তথ্যগুলি লেখার একটি কারণ আছে। এতো দামি জায়গা ঐ সময় যাদের বরাদ্দ করা হয় তারা রাষ্ট্রে যে খুব প্রভাবশালী তা বলাই বাহুল্য।

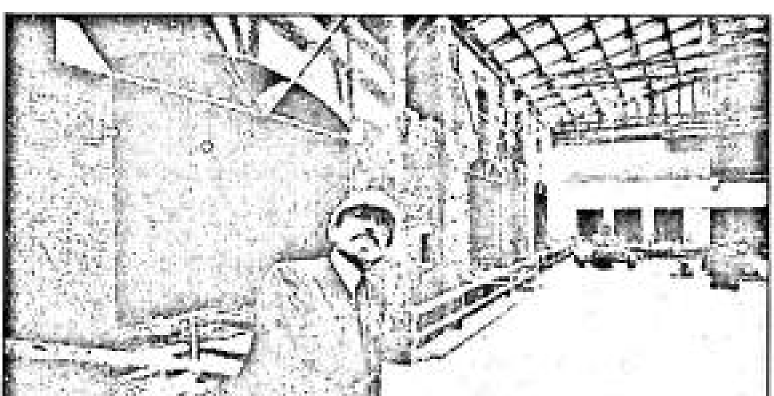

স্থপতি ফ্রিড অসটইথসে

এলি ওয়েজেল নামকরা লেখক। তখন খুব সম্ভব বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অসউইৎজে ছিলেন। খুব সম্ভব তাঁর নেতৃত্বে ইহুদি লবি ওয়াশিংটনে একটি হলোকাস্ট মিউজিয়াম গড়ার উদ্যোগ নেয়। প্রেসিডেন্ট তখন জিমি কার্টার। এ জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি এ বিষয়ে ওয়েজেল-কে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেন। এক বছর পর কমিশন প্রতিবেদন পেশ করে জানায় ওয়াশিংটনে হলোকাস্ট স্মরণে এটি জাতীয় জাদুঘর, একটি শিক্ষা ফাউন্ডেশন এবং একটি কমিটি অন কনসাস গঠন করা যেতে পারে। কংগ্রেস ১৯৮০ সালে এ বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করে। প্রায় ১৯০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা ওঠানো হয়। রোনাল্ড রিগ্যান ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৮৮ সালে। ১৯৯৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট চাইম হেরজগ, ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হার্ভে মেয়েরহফ ও এলি ওয়েজেল এর দ্বারোদঘাটন করেন। এর চারদিন পর পাবলিকের জন্য খুলে দেয়া হয় জাদুঘর। হলোকাস্ট মিউজিয়ামের প্রথম দর্শক ছিলেন চতুর্দশ দালাইলামা।

অন্যান্য গণহত্যা স্মারক/জাদুঘর থেকে ওয়াশিংটনের জাদুঘরটির প্রদর্শনীর ধরন অন্যরকম। প্রদর্শনীর কক্ষে ঢোকার সময় থেকেই দর্শকের মনে এ ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে যে তিনি সত্যি সত্যিই ক্যাম্পে ঢুকছেন।

এর একটি কারণও আছে বোধহয়। এর স্থপতি জেমস ইনগো ফ্রিড। জার্মানীর এক ইহুদি পরিবারে জন্ম। তার পরিবার ১৯৩৯ সালে পালিয়ে আসেন আমেরিকা। ফ্রিড নকশা করার আগে জার্মানীতে যেয়ে ঐ সময়ের স্থাপত্য দেখেন। সফর করেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জায়গাগুলি। তিনি এমনভাবে নকশা করেছেন যেখানে একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়, 'evoke deception, fear and solemnity'.[৪৯]

অসউইৎজে গড়ে তুলতে সময় লেগেছে। অসউইৎজ মুক্ত হওয়ার পরও এর খবর তেমন প্রচারিত হয়নি। বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক বরিস পলেভয় ২.২.১৯৪৫ সালে *প্রাভদায়* লিখেছিলেন, ফ্যাসিজমের শিকার অসউইৎজের বন্দিরা। ইহুদিদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। বুখেনওয়াল্ড, দাচাউ ও বের্গেন বেলসেন মুক্ত হলে এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সম্পর্কে সবাই জানতে পারেন।

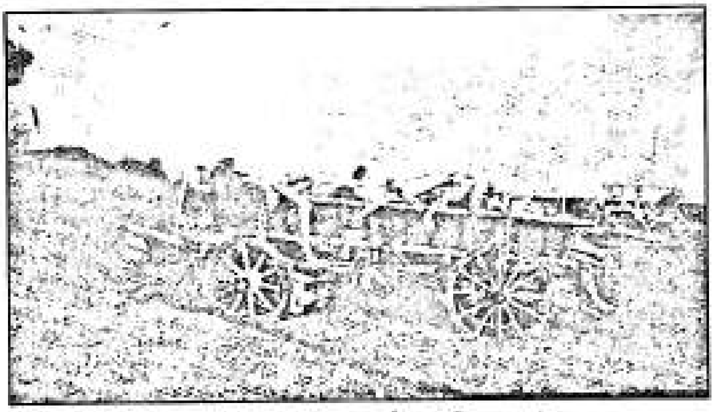

মুক্ত হওয়ার পর অসউইৎজে ঠেলাগাড়ি বোঝাই মৃতদেহ

অসউইৎজে বন্দি ছিলেন এমন কয়েকজন বিশ্বখ্যাত হলেন প্রাইমো লেভি, এলি ওয়েজেল এবং তাদেউস্জ বরোলিক। তিনজনই লেখক। ওয়েজেল শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮৬ সালে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট সাইমন ভেইল (১৯৭৯-৮২) ছিলেন অসউইৎজ-এ। ম্যাক্সিমিলিয়ন কোলবে স্বেচ্ছায় অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এডিথ স্টেইন ক্যাথলিক মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এদের দু'জনকেই সেইন্ট বা সাধু হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ২০০৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৭ জানুয়ারি বিশ্বে পালন করা হবে ইন্টারন্যাশনাল হলোকাস্ট রিমেমব্রান্স ডে।[৫০]

Acc No. 6747

২০১৭ সালে কোরবার ফাউন্ডেশন জার্মানীতে ১৪ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের ওপর একটি জরিপ চালায় অসউইৎজ নিয়ে। ৪০ ভাগ জানায় তারা অসউইৎজ সম্পর্কে জানে না। পরের বছর (২০১৮) যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মিউজিয়াম ও আরো কয়েকটি সংস্থা ১৩৫০ জন আমেরিকানের ওপর একটি জরিপ চালায়। ৪১ ভাগ জানায় তারা অসউইৎজ সম্পর্কে তারা কিছু জানেন না। ২২ ভাগ জানান 'হলোকাস্ট' শব্দটি তারা কখনও শোনেনি। ২০১৮ সালে সিএনএন-কমরেস ইউরোপে এ ধরনের একটি জরিপ চালায়। ফলাফল হয় একই রকম।[৫১]

এই দীর্ঘ বয়ানে দেখিয়েছি ইউরোপে যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো, সংরক্ষণের ঐতিহ্য আছে সেখানেও এই ধরনের জাদুঘর গড়তে দীর্ঘ সময় লেগেছে। মতাদর্শ, রাষ্ট্র পরিচালনায় কারা আছেন, কারা গণহত্যা জাদুঘরের প্রস্তাব করছেন, এসব বিবেচিত হয়েছে। যেটা সাধারণ মানুষ আশা করি দ্রুত এসব বিষয় সংরক্ষণ ও জাদুঘর করা তা হয় না।

গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক সব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই কম বেশি এটি প্রযোজ্য।

এসব কারণে, জার্মানী, পোল্যান্ড বা অন্যান্য অঞ্চলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু, তাতেও সময় লেগেছে। কারণ, রাজনৈতিক ভাল লাগা না লাগাও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন, নমপেনের যন্ত্রণালয় [টিরচারসেল বা নির্যাতন কেন্দ্র] বা বধ্যভূমি। প্রথমদিকে পলপট বা খিউসাম্পানের নৃশংসতা তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে, বর্তমান শাসকদের বৈধতা প্রদানের জন্য। তারপরও তখনই যন্ত্রণালয় বা বধ্যভূমি সংরক্ষিত হয়েছে তা নয়। সময় লেগেছে। স্থিতিশীলতা এসেছে রাষ্ট্রে। হুনসেন সরকারও ক্ষমতা সংহত করেছে। এখন সংরক্ষণে তারা বিনিয়োগে তেমন আগ্রহী নয়। আমার মনে হয়েছে, 'আপগ্রেড' করার

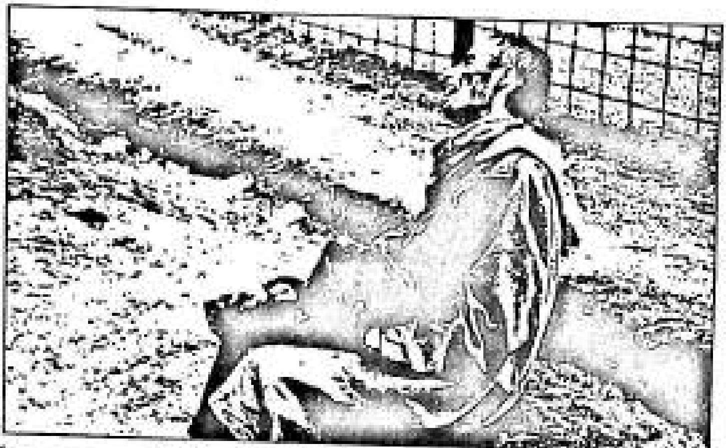

বের্গেন-বেলসেন, ১৭ ই এপ্রিল ১৯৪৫। মুক্ত হওয়ার পর বসে আছেন মৃতপ্রায় এক ব্যক্তি

জন্য নমপেনের এস-২১-এ যা দরকার রাষ্ট্র তা করেনি।[৫২] সারায়েভোতে বর্তমান সরকার গণহত্যা জাদুঘর/জাতীয় জাদুঘর বা অন্যান্য স্মৃতি সংরক্ষণে তেমন আগ্রহী নয়। যেমন, বসনিয়ার ইতিহাস তাদের কাছে একুশ শতকে গণহত্যা বা স্বাধীনতার পর। বসনিয়া ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু জাদুঘরে যারা আছেন তারা মনে করেন শাশ্বত ঐতিহ্য উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং, সরকার অর্থ প্রদান করবে না। জার্মানীর যে তথ্য কেন্দ্রের কথা লিখেছি তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়লেও বোঝা যায় সরকার নিজ থেকে এ ধরনের স্মৃতি সংরক্ষণে আগ্রহী ছিল না। অপরাধবোধ ও প্রভাবশালী 'পর চাপে পড়ে তা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করতে

ইউরোপ-আমেরিকায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ভিত্তি

পেয়েছে। গণতান্ত্রিকবোধ প্রণোদনা যুগিয়েছে স্মৃতি সংরক্ষণে। আবার ইউক্রেনের কথা ধরা যাক। তারা বাবিইয়ার সেভাবে সংরক্ষণ করেনি। হলোকাস্টের কথাও বলা হয় না বরং সোভিয়েত 'গণহত্যা'র স্মৃতি সংরক্ষণে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। সেখানে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ইতিহাস পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ভারসাম্য রাখতে হলে সরকারকে হলোকাস্টের স্মৃতিও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩

বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য দেশের কথা ধরা যাক। জার্মানীতে যুদ্ধ শেষে স্মারক স্তম্ভ করা হয়েছিল কিছু। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি মুক্ত হবার পরও স্মারক চিহ্ন/ফলক/স্তম্ভ হয়েছে কিছু। কিন্তু, আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ ও জাদুঘর করতে কমপক্ষে এক দশক তো লেগেছে। তাও সেগুলি সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন ইহুদিরা। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর এসব রক্ষার্থে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জার্মানীতে স্বেচ্ছায় তারা কোনো উদ্যোগ নিতে চায়নি। তারপর ইহুদিদের উদ্যোগ ও জনচাপের কারণে বার্লিনে জাদুঘর হয়েছে। সারায়েভোতে দু'দশক পর আমাদের মতো বেসরকারি উদ্যোগে জাদুঘর গড়ে উঠেছে। এবং সরকার তাতে সহায়তা করতে উৎসাহী হয়নি যা আগে উল্লেখ করেছি। কম্বোডিয়ায় পলপটের নৃশংসতা দেখাবার সুযোগ হারাতে চায়নি হুনসেন সরকার। তা ছাড়া, এস. ২১ তারা তৈরিই পেয়েছিল। কিন্তু, এখন সরকার তা সংরক্ষণে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক নয়। ওয়াশিংটনে হলোকাস্ট মিউজিয়াম হতে সময় লেগেছে ৭০ বছর অথচ যুক্তরাষ্ট্রেই ইহুদিরা সবচেয়ে প্রভাবশালী।

সুতরাং, হলোকাস্ট মিউজিয়াম মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইহুদি নির্যাতন গণহত্যার জাদুঘর। এবং তারা যেখানেই জাদুঘর করেছেন সেখানে হলোকাস্ট এসেছে। ধরা যাক, ওয়ার্সোর পলিন জাদুঘরের কথা। ইহুদি জীবনচর্যা তার বিষয়। সেখানেও আলাদাভাবে হলোকাস্ট এসেছে এবং কী পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে বলার মতো নয়।[৫৩] ইউক্রেনে গণহত্যা হয়েছে, কিছু স্মারক স্তম্ভও ছিল, সেগুলি অবহেলা অযত্নে লোক চক্ষুর আড়ালে চলে গেছে। সেখানে রাষ্ট্র বিনিয়োগ করছে প্রবলভাবে সোভিয়েত কর্তৃক 'গণহত্যা' প্রদর্শনে। এর পেছনে নব্য জাতীয়তাবাদী চেতনাও কাজ করছে।

বার্লিনে যে হলোকাস্ট জাদুঘর হয়েছে, তার পাশে এখন ভারসাম্য রাখার জন্য সমকামী ও জিপসিদের ওপরও দুটি তথ্যকেন্দ্র করা হয়েছে।

ইহুদিদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে আগ্রাসী মনোভাব তাদের পছন্দ নয় বলেই হয়ত এ প্রচেষ্টা তবে, একটি মৌল বিষয় আছে। সরকার কখনও উদ্যোগী হয় না এ ধরনেরজাদুঘর গড়তে, আমলাতন্ত্রও। স্বেচ্ছা উদ্যোগে তা শুরু হয়, জনমত বৃদ্ধি পেলে সরকার সহায়তা করে। কিন্তু, ইউরোপের সব সরকারকেই তা করতে হচ্ছে।

জাদুঘর নির্মিত হলেও মূল বিষয় থাকে কী দেখানো হবে। ইউরোপে গণহত্যায় এতো ছবি, নথিপত্র আছে যে বলার নয় এবং সংরক্ষণের ঐতিহ্য থাকায় তিল তিল করে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলে সব সুচারুভাবে সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। মানুষের নৃশংসতার দলিল হিসেবে এগুলি যুগযুগ ধরে টিকে থাকবে। যারা গণহত্যা করেছিল তারা আজীবন ঘৃণিত থাকবে। প্রযুক্তির এটি ভালো দিক।

অন্যদিকে, আমরা ৫০ বছর পর কাজে নেমে দেখি, যে পরিমাণ দলিল দস্তাবেজ বা আলোকচিত্র থাকার কথা তা নেই। সংরক্ষণের ঐতিহ্য আমাদের নেই। তাছাড়া, ঐ সময় ক্যামেরার/প্রযুক্তির অভাব ছিল। আজ আমরা যা পাচ্ছি বা সংগ্রহ করতে পারছি তা অনেকক্ষেত্রে ইন্টারনেটের কল্যাণে। কিন্তু যতটুকুই আমরা প্রদর্শন করি না কেনো নতুন দেশি বিদেশি প্রজন্ম যারাই আসছে তারাই বিস্মিত হচ্ছে। বিদেশিদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, এ গণহত্যার কথাতো আমরা জানতাম না।

বুখেনওয়াল্ড শিবিরে যারা বেঁচে ছিলেন

পছন্দ না করলেও ইউরোপ আমেরিকায় জাদুঘর বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। নামকরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা জাদুঘরে যে পরিমাণ দর্শক যায় তা অভাবনীয়। অর্থাৎ, এই বিনিয়োগে মুনাফা আসে। এমনকী কম্বোডিয়ায়ও খালি 'কিলিং ফিল্ডয়ের' জন্য অনেকে আসেন। বলতে পারেন এগুলি এক ধরনেরকৃষ্ণ পর্যটন বা ব্ল্যাক ট্যুরিজম। হ্যাঁ আমাদের এখানে সে পরিমাণ বিনিয়োগ হবে না, সম্ভব হলেও হবে না। কিন্তু, এ ধরনের জাদুঘর তো আমাদের ইতিহাসের বয়ান তৈরি করে। আমাদের বুঝতে সহায়তা করে, আমাদের পূর্বসূরীরা কী চেয়েছিলেন এবং যা চেয়েছিলেন তার জন্য কী মূল্য দিতে হয়েছে। অপরাজনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট হবে এবং অপরাজনীতি থেকে সরে আসবে। শুধু তাই নয়, ঘাতকরা কি করেছিল তাও স্পষ্ট হবে এবং এ সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে স্পষ্টতর হবে।

১৪

যারা গণহত্যা করে প্রথমেই তারা তা অস্বীকার করে। বাংলাদেশে গণহত্যার কথা পাকিস্তান কখনও স্বীকার করেনি। বরং তা খাটো করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার একটা বিষময় ফল আছে। যুদ্ধাপরাধের বিচার পাকিস্তানে হয়নি কারণ গণহত্যা তারা স্বীকার করেনি।

এরপর কি হয়েছে? পাকিস্তানে আর হত্যার দায়ভার কারো ওপর চাপানো যায়নি। জঙ্গি মৌলবাদীরা শক্তিশালী হয়েছে। বিচার না করায় রাষ্ট্রে দায়বদ্ধতা তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রে বিভিন্ন গ্রুপের আধিপত্য। ফলে পাকিস্তান এখন এক ব্যর্থ রাষ্ট্র। কোরিয়া-চীনে, জাপান গণহত্যা স্বীকার করেনি। কিন্তু এখন ইতিহাস অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছে। কোরিয় বীরাঙ্গনাদের হয়তো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে জাপানিদের যা গণহত্যা স্বীকারেরই শামিল। আমাকে এক লিবারেল জাপানি গবেষক বলেছিলেন, তার দেশে পাঠ্যপুস্তকে জাপানের গণহত্যার উল্লেখ নেই। ইউরোপ স্বীকার করেছে। দায়ভার নিয়েছে এবং এগিয়ে গেছে। সে কারণে, নিজ দেশে তারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মানবিকতাবোধ ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার না পেলে, মানবিক বোধের উজ্জীবন না করলে রাষ্ট্র তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়। রাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহার না করে শাসক শব্দটি ব্যবহার করা চলে। বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও খালেদা জিয়া পাকিস্তানি ধারায়ই কাজ করেছিলেন। ফলে, তারা বাংলাদেশকে প্রায় ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। আজ তাদের পরিণতি দেখুন। শেখ হাসিনা

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করেছেন এবং এখনও তা চলমান। একই সঙ্গে জঙ্গি মৌলবাদকেও দমন করেছেন। রাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে এবং শেখ হাসিনার অবস্থান কোথায় দেখুন।

আমরা 'গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' করেছি। এর নিশ্চয় একটি উদ্দেশ্য আছে আগে উল্লেখ করেছি। বলতে পারেন অনেকে, এটি একটি রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট। বিপরীত মত, অর্থাৎ গণহত্যা-নির্যাতন অস্বীকার করার প্রবণতাও রাজনৈতিক। সুতরাং, আমাদের বেছে নিতে হবে কোন ধারার রাজনীতি আমাদের লক্ষ্য। আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বলে অনেকে তৃপ্তি পান। বিএনপির রাজনীতি কি জাতীয়তাবাদ বহির্ভূত? আওয়ামী লীগের রাজনীতি যদি জাতীয়তাবাদীও হয় সেখানে কয়েকটি উপাদান অবশ্যই বিবেচ্য। ধর্ম নিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বর্ণ বা জাতপাত বিরোধীতা। যারা ১৯৭১ সালের খুনি বা এখন খুনিদের সমর্থক তাদের বিরোধী রাজনীতির প্রসারণ অবশ্যই কাম্য। মানবতা বিরোধী অপরাধ বিচারের আন্দোলনও আমরা করেছি চারদশক। কারণ, আমাদের মনে হয়েছে এর বিচার না হলে শুধু দেশে নয় বাইরেও গণহত্যাকারীরা স্বস্তি বোধ করে এবং অনবরত গণহত্যা চালিয়ে যায়। পাকিস্তান মিয়ানমার এর উদাহরণ। শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, গণহত্যার একটি স্বীকৃতি দরকার দেশে বিদেশে। "এই স্বীকৃতি দেশেও দেশের বাইরে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকারীদের গণহত্যা অস্বীকারের অপচেষ্টা নিরুৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের আত্মপরিচয়ের সংকটও মোচন করবে এই স্বীকৃতি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্মকে জানতে হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি জাতিকে যে চরম মূল্য দিতে হয়েছে তা অন্যকোনও জাতিকে কখনও দিতে হয়নি।"[৫৪]

চৌধুরী শহীদ কাদের লিখেছেন, "আমাদের সামষ্টিক স্মৃতি থেকে গণহত্যা মুছে দেয়ার একটা চেষ্টা সব সময় ছিল। কোনো সন্দেহ নেই, এই মুছে দেয়ার চেষ্টা মোটেই রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়।"[৫৫]

সেটি জেনেই আমরা গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণে নানাবিধ কাজ করছি। এ প্রসঙ্গে সরকারের একটি সমীক্ষার কথা তুলে ধরছি।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় ৩৫টি বধ্যভূমি নির্বাচন করেছে স্মৃতিসৌধ করার জন্য। এ প্রকল্প শুরু হয়েছে এ শতাব্দীর শুরুতে কিন্তু এখনও পুরোপুরি শুরু করতে পারেনি। সরকারের 'বাস্তবায়ণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ' [আইএমইডি] ২০১৬ সালে একটি সমীক্ষা করে যা এখনও প্রাসঙ্গিক। মূল লক্ষ্য ছিল "প্রকল্প এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার প্রভাব মূল্যায়ণ বিশেষত: যুব

সমাজের উপর প্রকল্পের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারিতা যাচাই করা।"[৫৩]

এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রায় সাড়ে পাঁচশ জনের ওপর সমীক্ষা চালায়। সেখানে নিরক্ষর থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত মানুষজন আছেন। আশার কথা তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছে কিন্তু এরপর মুক্তিযুদ্ধের পরিচিত অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রায় ৪০ ভাগ কিছু জানে না। আগে লিখেছে জার্মানিতেও হলোকাস্ট সম্পর্কে অনেকে জানে না। তবে, আমাদের এখানে না জানার অনেক কারণ আছে। এক, তিন দশক ইতিহাসের বিকৃতিকরণ করা হয়েছে, দুই, ইতিহাস জানতে দেয়া হয়নি, তিন, এ আমলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় না পুরোপুরি।

ইতিহাস সম্মিলনী থেকে ২০১৬ সালে আমরা সংসদীয় কমিটিতে গিয়েছিলাম ইতিহাস যাতে পড়ানো হয় সে বিষয়টি আলোচনার জন্য। পৃথিবীতে ইতিহাস পড়ানোর জন্য সংসদীয় কমিটিতে যাওয়ার ইতিহাস বোধহয় এই প্রথম। কমিটি এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিল কিন্তু কোনো নির্দেশ দেয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঐ বছর তার অধীনস্থ সব কলেজে ১০০ নম্বরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চালু করে। অর্থাৎ কলেজে সব বিষয়ের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়তে হবে। আশা করতে পারি গত পাঁচ বছরে পরিস্থিতির হয়ত খানিকটা উন্নতি হয়েছে।

গণহত্যা বিষয়ক সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। ৮-২ ভাগ জানিয়েছেন এবং ৮২-৫০ জানেন তাদের জন্যই স্মৃতিস্তম্ভ করা হয়েছে। ৮৪.৮ জন তরুণ জানেন তার এলাকায় বধ্যভূমি আছে। যেখানে স্মৃতিস্তম্ভ আছে সেখানে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলে ৬০ ভাগ মনে করেন। ৭২ ভাগ মনে করেন স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের ফলে তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

সমীক্ষার সারণিগুলি থেকে, অনুমান করতে পারি, তিন দশকের ইতিহাস বিকৃতি ও সরকার ও নাগরিকদের অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেই উদাসীনতা একেবারে সাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বা গণহত্যা সম্পর্কে বিস্মৃত করেনি। তবে আমরা মনে করি শুধু স্মৃতি ফলকই নয় এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

আমরা তাই শুধু নৃশংসতার প্রদর্শনই নয়, অন্যান্য কার্যক্রমও হাতে নিয়েছি যাতে তৃণমূলে পৌঁছা যায়। গণহত্যা জাদুঘর তুলে ধরেছে পাকিস্তান কী করেছে, তাদের বাঙালি সহযোগী ঘাতকরা কী করেছে। নতুন প্রজন্ম তা দেখে শিউরে উঠছে। মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি তাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। যারা

ঘাতকদের সহায়তা করছে রাজনীতিতে তাদের সম্পর্কেও ধারণা স্বচ্ছ হচ্ছে। গণহত্যা জাদুঘরের অধীনে একটি গবেষণা কেন্দ্র আছে– 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র।' এই গবেষণা কেন্দ্র নানা ধরনের গবেষণা করছে। যেমন, প্রতিটি গণহত্যা নিয়ে একটি বই। এই সিরিজের নাম 'গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট'। ১০০টি গ্রন্থ এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়েছে, আরো ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়। এ ধরনের গবেষণায় তৃণমূলদের কথা উঠে আসছে যারা ছিল উপেক্ষিত। শুধু তাই নয় এমন সব স্থানের গণহত্যার কথা উঠে আসছে যা আগে আমরা জানতাম না। ৫০ বছর পর আমরা প্রতিটি জেলায় 'গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ' সম্পর্কিত একটি জরিপ পরিচালনা করি। তৃণমূল পর্যায়ে এ ধরনের গবেষণা প্রথম। এর ফলাফল আমাদের অবাক করেছে। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের জানাটা কম। ৩২টি জেলায় আমাদের গবেষণার ফল এরকম– আগে জানা ছিল গণহত্যার সংখ্যা ২৪৬ এখন ১১৭৫৬। গণকবরের সংখ্যা ছিল ৮১ এখন ৯৯২। যন্ত্রণালয় বা নির্যাতন কেন্দ্রের সংখ্যা আগের গবেষণা অনুযায়ী ৪০ এখন ১০৭১। বধ্যভূমির সংখ্যা ছিল ১৫৯ এখন ৭৩৬। এটি হলো অর্ধেক বাংলাদেশের হিসাব। এ পরিসংখ্যান তুলে ধরে তৃণমূল পর্যায়ে নির্যাতন ও হত্যার তীব্রতা। আরো তুলে ধরে শহিদদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ নয় আরো বেশি হতে পারে। অর্থাৎ তৃণমূলকে ইতিহাসে সম্পৃক্ত করার কারণে ইতিহাসই বদলে যাচ্ছে।

বসনিয়া গণহত্যায় নিহত স্বজনের জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ছেন এক নারী

যে সব স্থানে গণহত্যা হয়েছিল, ছিল বধ্যভূমি বা গণকবর সে স্থানগুলিও দখল হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে সামরিক শাসক ও তাদের প্রশ্রিদের আমলে। এখানে আসে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের দ্বন্দ্বটি। আমাদের

মতো দেশে উন্নয়নের অর্থ বিদ্যমান যা কিছু আছে তা ভেঙে নতুন করে করা। ইতিহাসের স্বার্থে যা সংরক্ষিত তাও। উন্নয়নের বিপক্ষে কেউ নয়। সংরক্ষণ করেও উন্নয়ন করা যেতে পারে। গণহত্যার স্থানে বা বধ্যভূমির স্থানে একটি ফলক, আধাকাঠা জমির ওপর, উন্নয়নের স্বার্থে বিঘ্ন ঘটায় না। আমাদের সীমিত সামর্থ্যে আমরা এসব স্থানে প্রায় ৫০টি ফলক লাগিয়েছি। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, তৃণমূলের মানুষজন এতে উজ্জীবিত হয়েছে। যারাই ফলকটি দেখছেন, থামছেন ও ফলকের লেখা পড়ছেন। খুলনা সার্কিট হাউসের সামনে আমরা একটি ফলক লাগিয়েছি। তাতে ১৯৭১ সালে সার্কিট হাউসে নির্যাতন কেন্দ্র ও হত্যার কথা লেখা আছে। এটি লাগাবার সময় তৎকালীন ডিসি মৃদু আপত্তি করেছিলেন। আমরা গ্রাহ্য করিনি। একদিন সকালে দেখি, এক রিকশাঅলা রিকশা থামিয়ে লেখাগুলি পড়ছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কী হইছে এখানে। আমরা কিছুই জানি না।' এখন জানলেন। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে। এভাবে বর্তমান যুক্ত হচ্ছে ইতিহাসের সঙ্গে, অতীতের সঙ্গে।

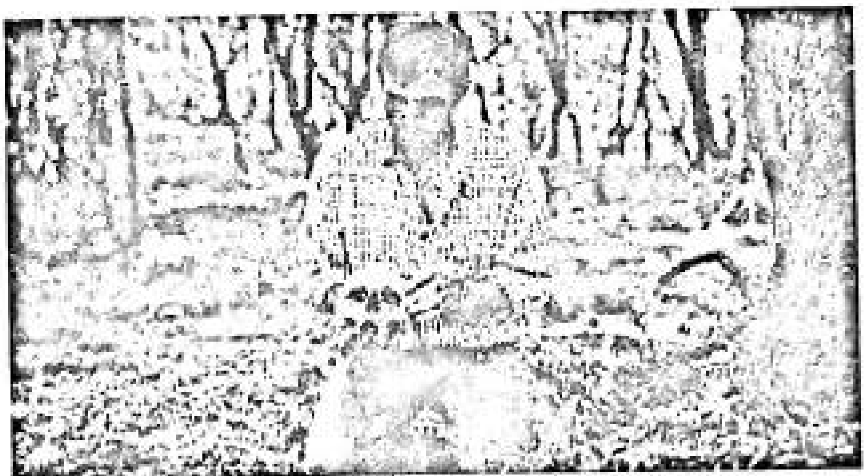
বসুনিয়ায় গণকবর

আমরা বিভিন্ন জেলায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ করাচ্ছি যেখানে শিক্ষকরাই বেশি যোগ দিচ্ছেন। এই প্রথম তারা মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, লিখছেন এবং তা প্রকাশিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ চর্চা যাতে অব্যাহত থাকে, পরম্পরা থাকে সেই প্রচেষ্টা নিয়েছি এবং তা সফল হচ্ছে। এসবই হচ্ছে গণহত্যা জাদুঘরকে ঘিরে। ক্রমেই এ জাদুঘর ও এর কর্মকান্ড অভিঘাত হানছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা কঠিন হতো যদি শেখ হাসিনা সহায়তার হাত বাড়িয়ে না দিতেন।

অন্যান্য গণহত্যা জাদুঘরও কমবেশি গবেষণা করছে, প্রকাশনা করছে। কেউ সরকারি সহায়তা পান, কেউ পান না। কিন্তু, সিভিল সমাজ সহায়তা করছে। জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করছে।

আশার বিষয় এই যে, গণহত্যা যে মানবতা বিরোধী অপরাধ তা ক্রমেই রাজনীতিবিদরা মেনে নিচ্ছেন এবং এ কারণে রাষ্ট্রে গণহত্যাকারি ও সমর্থনকারিদের আধিপত্য হ্রাস পাচ্ছে। তা না হলে ১৯৪৫ সাল থেকে বেশ কিছু গণহত্যার বিচার হতো না। যেমন, নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, জার্মানী (১৯৪৫), টোকিয়ো ট্রাইব্যুনাল, জাপান (১৯৪৬), যুগোশ্লোভিয়া ট্রাইব্যুনাল, হল্যান্ড (১৯৩৩), রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল, তানজানিয়া (১৯৯৪), সিয়েরা লিওন (২০০২), খেমারুজ বিচার, কম্বোডিয়া (২০০১) ইত্যাদি।

আরেকটি উদাহরণ দিই। জাপান কোনো সময় নানকিং গণহত্যা স্বীকার করেনি। আমেরিকা প্রভাবিত করেছে জাপান [পরোক্ষভাবে] দীর্ঘদিন, চীনেও স্থিতিশীলতা ছিল না দীর্ঘদিন। ফলে, নানকিং গণহত্যা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গত শতকের নব্বই দশক থেকে এ বিষয়ে অনেকে গবেষণা করেন। এর মধ্যে আইরিশ চ্যাংয়ের *দি রেপ অব নানকিং* বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এখন আবার জাপানের ওপর তা স্বীকার করার চাপ বাড়ছে। আসলে, এক্ষেত্রে একাডেমিশিয়ানদের একটি দায় আছে। তারা এ বিষয়ে গবেষণা করে সত্য তুলে ধরবেন বিভিন্ন গণহত্যা সম্পর্কে, যাতে সমাজে এ সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং সত্য স্বীকারে সাহস সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রে গণহত্যার রাজনীতি যাতে আধিপত্য বিস্তার না করে সে জন্য নিত্য এই অপরাধের বিবরণ বা সত্য তুলে ধরতে হবে যেমনটি হয়েছে হলোকাস্টের ক্ষেত্রে। এ সত্য বিকশিত করার দায়িত্ব আমাদের। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আমরা যখন তা করতে পারব বিশ্ব জুড়ে তখনই রাষ্ট্রে গণহত্যাকারীদের আধিপত্য হ্রাস পাবে।

রোহিঙ্গা গণহত্যার দায় তখন বর্মি জেনারেল ও সুচি- কে বহন করতে হবে। গণহত্যা জাদুঘর/বধ্যভূমি/গণকবর এভাবেই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারে।

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতায় এটি অনুধাবন করছি গণতন্ত্র না থাকলে এ ধরনের কাজ দুরূহ যদি না সরকারের স্বার্থের সঙ্গে তা মিলে যায়। সমাজ রাষ্ট্র যত গণতান্ত্রিক হবে, এ ধরনেরকাজ ততো বেশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমর্থন পাবে। ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই গণহত্যার বিপরীত মতাদর্শ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এবং রাজনীতিতে সে মতাদর্শ ছড়িয়ে দেয়া বা সংহত করা যেতে পারে। মানস জগতে এ মতাদর্শ আধিপত্য বিস্তার করলে সাধারণের অপরাজনীতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

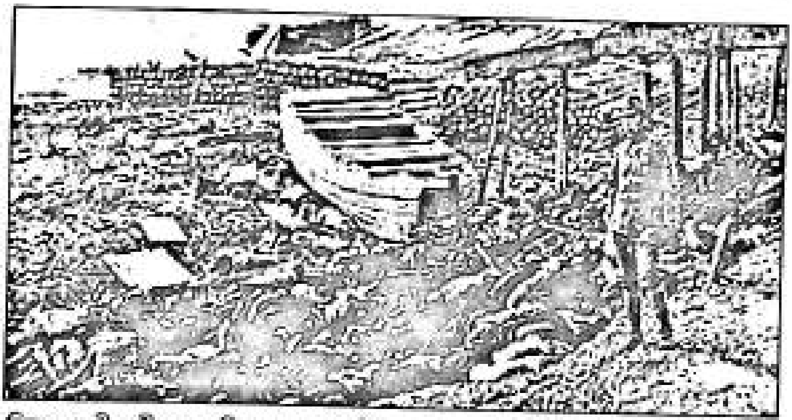

কিনহুন নদীর তীরে নানকিং হত্যাকাণ্ডে নিহতদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক জাপানি সেনা

আমরা গণহত্যার যে রাজনীতি/দর্শন তা সবাইকে নিয়ে উৎপাটন করতে চাই। ১৯৭১ সালে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান খুনীদের নিজ দলে নেওয়ার জন্য এই আইন বাতিল করেছিলেন। আজ সৌদী আরব ইসরায়েলকে বরণ করতে যাচ্ছে। অথচ, সউদী রাজতন্ত্র নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেহাদের নিরন্তর প্রচার চালিয়েছে। ধর্ম নিয়ে এই যে প্রতারণা তা বন্ধেও গণহত্যা-নির্যাতনের বিষয়টি নিরন্তর বলে যেতে হবে।

নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা ৫০টি স্মৃতিফলক স্থাপন করেছি এমন সব বধ্যভূমি বা গণহত্যার স্থানে যার নাম কেউ শোনেননি। শহীদ কাদের যথার্থই লিখেছেন– "গণহত্যার স্মৃতি স্মরণ করে ও ভিকটিমদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা আরো মানবিক হয়ে উঠি। এই মানবিক হয়ে উঠা একটি মানবিক সমাজ গঠনের গোড়ার শর্ত।"[২৭]

স্মৃতিই শক্তি। স্মৃতিই ইতিহাস। গণহত্যা-নির্যাতনের স্মৃতি সংরক্ষণ স্মৃতি ও ইতিহাসকে স্মরণে করবে। ১৯৭১ সাল থেকে প্রজন্ম বিচ্ছিন্ন হবে না। আমরাতো সেটিই চাই।

সাংবাদিক ক্রিশিয়ানা ল্যাম্ব, সিরাজগঞ্জে বাংলাদেশের এক বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। আয়েশা নামে এই বীরাঙ্গনা বলেছিলেন– "We have given our most precious thing and have died inside many times but you wont find our names engraved on any monument of war memorial."[২৮]

গণহত্যা জাদুঘর নির্মিত স্মৃতিফলক, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল, খুলনা

১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর করা হয়েছে যাতে এই আক্ষেপ আর কেউ না করেন।

* *গণহত্যা জাদুঘর: রাষ্ট্র রাজনীতি আধিপত্য* নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে [২০২১]। বইয়ের নাম ছিল প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম। সেই প্রবন্ধটিকে তিনগুণ বর্ধিত করে প্রায় নতুন করে লেখা হয়েছে। এবং এতে পূর্ণতা প্রদান করতে গিয়ে এই বই ও আমার রচিত বিভিন্ন বই/প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ সংযোজন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Jeffery C. Alexander, The Dark side of Modernity, P.I, quoted in Imtiaz Ahmed (ed.) *Genocide and Mass Violence, Politics of Singularity*, Dhaka, 2019, Introduction p. vvi-xvii.

''As modernity emerged, so did colonial expansion; as modernity intensified, colonial domination deepened in the name of Enlightenment and civilization. From Napoleon onward, modern nations waged wars for progress with heinous weapons forged by technological reasons. In the middle of the twentieth century, Germany, a nation of scientific and Enlightenment Bildung, committed genocidal murder against six million Jews and killed million more innocents and soldiers in a war almost succeeded in returning Europe to medieval times. Two decades later, the American Air Force tried bombing Vietnam back to the Stone Age."

২. বিস্তারিত, জিয়াউল হক, 'পাকিস্তানি ও ইসলামী মতাদর্শ', হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ সম্পাদিত, *পাকিস্তান: ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি*, ঢাকা, ১৯৮৬।

৩. ঐ।

৪. ঐ।

৫. বিস্তারিত দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, ২০১৯।

৬. বিস্তারিত, Z. A. Bhutto, 'West Pakistan Thrives at the Cost of East Pakistan' C Rajeswara Rao (ed), *Case for Bangla Desh*, New Delhi, 1971.

৭. উক্তিগুলি নেয়া হয়েছে, Inam Ahmed & Shakhawat Liton (ed) *Genocide They Wrote*, Dhaka, 2016.

৮. নিয়াজী মনে করেন, শুধু হিন্দুদের হত্যাই নয় ইসলামের বিশ্বাসঘাতক বা তাদের ভ্রাতাদের, মুরতাদদেরও হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানদের।

নিয়াজী শেষ পরিচ্ছেদে বিহারিদের উল্লেখ করে লিখেছেন, তাদের মধ্যে আস্থা ও সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে যাদের 'সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স' হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এপটভূমিতে তিনি ৮টি সুপারিশ (বা সমাধান) করেছেন–

১. ডাক্তার এবং প্রফেসরসহ ৭৫% বাঙালি সিভিল অফিসারদের হত্যা করতে হবে এবং বাকি উচ্চপদস্থদের পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি করতে হবে। সেনা, পুলিশ ও সিভিল আর্মড ফোর্সকে বাঙালিশূন্য করতে হবে।

২. সেনা, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমস্ত গোয়েন্দা সার্ভিসকে বাঙালিমুক্ত করতে হবে। কারণ, এরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্কে সরকারকে অন্ধকারে রাখছে।
৩. সারা পাকিস্তানের জন্য একটি জাতীয় ভাষাই থাকবে যা হবে একমাত্র 'মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন।'
৪. প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগকে 'স্ট্রিম লাইন' করতে হবে।
৫. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এমন করতে হবে যেখানে বাংলা (বেঙ্গল) কে ১০ বছরের জন্য 'স্পেশাল স্টেটাস' দিতে হবে বা সেনাবাহিনী প্রধানের মতে, যতদিন পর্যন্ত না মুক্তিবাহিনী বা অনুপ্রবেশকারীদের কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটে।
৬. পূর্ব পাকিস্তানের চারটি এলাকা বিহারি অধ্যুষিত করতে হবে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং সৈয়দপুর পার্বতীপুর। ওপরে বর্ণিত তিনটি শহর বিহারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এসব এলাকায় পাকিস্তানবিরোধী কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত না করা যায়।
৭. ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সব বিহারিকে সশস্ত্র করতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেনা গোয়েন্দা বিভাগ যাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবে তাদেরই শুধু বাদ রাখা যাবে।
৮. গৃহায়ন এবং ত্রাণ বিভাগ পরিচালিত হবে অন্তত উপরের দিকে অবাঙালিদের দ্বারা–
   ক. মিরপুরের ৫০০ প্লট এখন খালি আছে নিম্নআয়ের লোকদের জন্য। তা এখনই বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।
   খ. মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার রিফিউজিদের [বিহারি] বরাদ্দ করতে হবে।
   গ. মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর ও আশেপাশের সব এলাকা অবাঙালিদের বরাদ্দ করতে হবে।
   ঘ. মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর ও আশেপাশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উর্দু স্কুল এবং কলেজে পরিণত করে অবাঙালি ছেলেমেয়েদের জন্য খুলে দিতে হবে।
   ঙ. মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের সব সরকারি দোকান রিফিউজিদের বরাদ্দ করতে হবে।
   চ. মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের সব রেশন দোকানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

এ সম্পর্কিত দলিলটি প্রদর্শিত হচ্ছে গণহত্যা জাদুঘরে।

৯. বিস্তারিত, মুনতাসীর মামুন, *সেইসব পাকিস্তানি*, ঢাকা, ১৯৯৯।
১০. মানস ঘোষ, 'একজন সাংবাদিকের চোখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ', *বাংলা বিচিত্রা*, ঢাকা, মার্চ, ২০২১, পৃ. ২৫।
১১. বিস্তারিত, J. N. Dixit, Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations.

১২. ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর, দ্রষ্টব্য নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে–

Tapati Guha Thakurta, *Monument, Object, Histories, Institutions of Art in Colonial and Postcolonial India*, Delhi, 2004.

১৩. সেই সময় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডে ছিলেন তিনি।

১৪. ১৯৯১ সালে অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী ঢাকায় এলে আমি তাঁর দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি যা পরে অর্ন্তভুক্ত হয় ঢাকা সম্পর্কিত আমার গ্রন্থ– *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান*, ঢাকা, ১৯৯১–এতে। এখানে দানী সম্পর্কিত বয়ানটি সেই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ।

১৫. জুনায়েদ আহমদ করাচি ন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেন্টস এর চেয়ারম্যান। কনসালটেন্সি হিসেব বইটি লিখেছেন। অনুমিত এই কনসালটেন্সি ছিল আই এস আই প্রদত্ত। বইটির নাম– *ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ: মিথস এক্সপোজড*, করাচি ২০১৭। বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, মুনতাসীর মামুন, 'আই এস আই ও মুক্তিযুদ্ধ,' মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: অন্যভাবে দেখা*, ঢাকা, ২০১৮।

১৬. তোফায়েল আহমদ, *ইতিহাসের সত্য ও গণহত্যা দিবস*, ২৪ মার্চ ২০১৯, ভোরের কাগজ। 'সংসদ সদস্য শিরিন আখতার নির্মূল কমিটির দাবির আলোকে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের জন্য আগে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। পরে, সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণহত্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।'

১৭. লেমকিন লিখেছিলেন–

''Genocide has two phases. One destruction of the national patterns of the oppressed group; the other the is position of national pattern of the oppressors." Raphael Lemkin's *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for Redress*, (Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944)

স্বদেশ রায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, পঠিত হয়েছিল ০৫.০৩.২০২১ বাংলা একাডেমিতে, নাম 'বাংলাদেশের গণহত্যা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি'।

"Genocide means act committed with the intent to destroy whole or in part any national, ethnic racial or religious group as such."

১৮. Yasmin Saikia, *Women War and Making of Bangladesh: Remembering 1971*.

এই বই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, 'মুক্তিযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও ধর্ষণ', মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, অন্যভাবে দেখা*, ঢাকা, ২০১৮। ইয়াসমিনের বই নিয়ে আলোচনার অংশটুকু এ প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

১৯. বিবিসি, বাংলা, ২১.১২.২০১৫, *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ১১.০২.২০১৬।

২০. পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেখুন মুনতাসীর মামুন, *সেই সব পাকিস্তানি*, ঢাকা, ১৯৯৯ ও *পাকিস্তানি জেনারেলদের মন : বাঙালি, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, ২০১০; *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ* [মহিউদ্দিন আহমদের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা], ঢাকা, ২০০৫।

২১. মুনতাসীর মামুন, বিস্তারিত বিবরণের জন্য *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*, ঢাকা, ২০১৩; একই লেখকের *গণহত্যা-নির্যাতন*, ঢাকা, ২০১৪।

২২. বীনা ডি কস্তা, 'ড. জেফ্রি ডেভিস : যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী একজন ডাক্তার', আসক, যুদ্ধাপরাধ, ঢাকা, ২০০৮ পৃ. ৪৭–৫৪।

২৩. 'নারী নির্যাতন' *বাংলার বাণী* [গণহত্যা বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৭২]।

২৪. *নিউজউইক*, ১৫.১১.১৯৭১, রোকেয়া কবীর ও মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৮০

২৫. 'নারী নির্যাতন' *বাংলার বাণী* [গণহত্যা বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৭২]।

২৬. *ঐ*।

২৭. বিস্তারিত, *Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women & Rape*, New York, 1975.

২৮. সুসান ব্রাউনমিলার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

২৯. ডা. এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩১।

৩০. *ঐ*, পৃ. ৩২।

৩১. "A stream of victims and eyewitnesses tell how truck load of Pakistani soldiers and their hirling *rajakars swooped* down on village in the night, rounding up women by force. Some were raped on the spot. Others were carried off to military campounds. Some women were still there when Indian troops battled their way into Pakistani straghölds. Weeping survivors of villages razed because they were suspected siding with the Mukti Bahini freedom fighters told how wives were raped before the eyes of their bound husbands, who were put to death. Just how much it was the work of Pakistani 'regulars' is not clear. Pakistani officers maintain that their men were too disciplined fot that sort of thing."

Report of Joseph Friend, quoted in Brownmiller, *op cit.*

৩২. উদ্ধৃত, উম্মে হাবিবা সুমী, ৭১– *এর গণধর্ষণের বিচার প্রসঙ্গে যুদ্ধাপরাধ*।

৩৩. *ঐ*।

৩৪. *ঐ*।

৩৫. *ঐ*।

৩৬. *ঐ*।

৩৭. রোকেয়া কবীর , মুজিব মেহদী, মুক্তিযুদ্ধে নারী, ঢাকা, ২০০৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
৩৮. শাহরিয়ার কবির, 'একাত্তরে নারী নির্যাতন এবং নির্যাতিতদের সামাজিক অবস্থান', *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৫।
৩৯. বিস্তারিত, A.A.K.Niazi, Lt. Gen. *The Betrayal of East Pakistan*, 1998, পরিশিষ্ট।
৪০. বিস্তারিত, Archer K. Blood, *The Blood Telegram*, Dhaka.
৪১. বিস্তারিত, *সেই সব পাকিস্তানি*।
৪২. ধর্ষণ সম্পর্কিত বিবরণের কিছু অংশ আমার লেখা *বীরাঙ্গনা ১৯৭১*- থেকে নেয়া হয়েছে।
৪৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: *Information Centre at the Memorial to the Murdered Jews of Europe*, Berlin, 2016, ও অন্তর্জাল থেকে।
৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: Wieland Giebel, *Berlin Story Bunker*, ও অন্তর্জাল থেকে।
৪৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: *Genocide-Holodomor 1932-1933, The Losses of the Ukrainian National*, Kiev, 2016।
৪৬. Eberhard Kolb, *Bergen-Belsen from 1943-1945*, Vandenhoeck & Ruprecht, Munich, 1988.
৪৭. *Anne Frank House: A Museum with a Story*, Amsterdum, 1992
৪৮. Jasminko Halilovic, *War Childhood, War Childhood Museum*, Poland, 2018; Selma Leydesdorff, *Surviving the Bosnian Genocide: The Women of Srebrenica Speak*, 2011; Paul R. Bartrop, *Bosnian Genocide: The Essential Reference Guide*, ABC-CLIO, 2016; Jan Willem Honig & Norbert Both, *Srebrenica: Record of a War Crime*, 1997; Norman L. Cigar, *Genocide in Bosnia: The Policy of "ethnic Cleansing"*, 1995; David Rieff, *Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West*, 1996
৪৯. এ বিষয়ে দেখুনঃ Edward T. Linenthal, *Preserving Memory: The Struggle to Create America's Holocaust Museum*, London, 1995
৫০. Ian Baxter, *Auschwitz and Birkenau (Images Of War)*, Pen and Sword Military, 2016; Ian Baxter, *Auschwitz Death Camp (Images of War)*, Pen & Sword Military, 2010
৫১. বিভিন্ন জাদুঘর স্থাপন ও বিকাশের বয়ানের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *গণহত্যা জাদুঘরঃ রাষ্ট্র রাজনীতি ও আধিপত্য*, ঢাকা, ২০২১।
৫২. ভিক্টিমের বয়ানের জন্য দেখুনঃ
Huy Vannak, *Bou Meng: A Survivor From Khmer Rouge Prison S-21, Justice for the Future Not Just for the Victims*, Documentation

Center of Cambodia, 2010; Chum Mey, *Survivor: The Triumph of an Ordinary Man in the Khmer Rouge Genocide*, Documentation Center of Cambodia, 2012; Eng Kok Thay, *Norng Chan Phal - the Mystery of the Boy at S-2*, Cambodian Institute for Peace and Development, 2018; *Tuol Sleng Genocide Museum*, Phnom Penh, Cambodia

৫৩. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (ed.), *Polin: 1000 Year History of Polish Jews*, Muzeum Historii Zydow, Warszawa, 2017

৫৪. শাহরিয়ার কবির, *১৯৭১– এর গণহত্যার পাঁচ দশক: স্বীকৃতি, বিচার ও ইতিহাসের দায়*, ঢাকা, ২০২১।

৫৫. চৌধুরী শহীদ কাদের, *গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণ ও গণহত্যা জাদুঘর*, ঢাকা, ২০২১।

৫৬. আই এমইডি [পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন: ১৯৭১– এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প*, ঢাকা, ২০১৬।

৫৭. চৌধুরী শহীদ কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৫৮. Christina Lamb, *Our Bodies Their Battlefield : What War Does to Women*, London, 2020.

শাহরিয়ার লিখেছেন "ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, ভাষা, অঞ্চল, যে কারণেই হোক, বিশ্বকে গণহত্যার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে গণহত্যার স্বীকৃতি খুবই জরুরী। এই স্বীকৃতি গণহত্যায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি দেশে দেশে গণহত্যাকারীদের বিচারের পথ সুগম করবে। একই সঙ্গে অপরাধ থেকে দায়মুক্তির কলঙ্ক থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করবে।" *প্রাগুক্ত*।